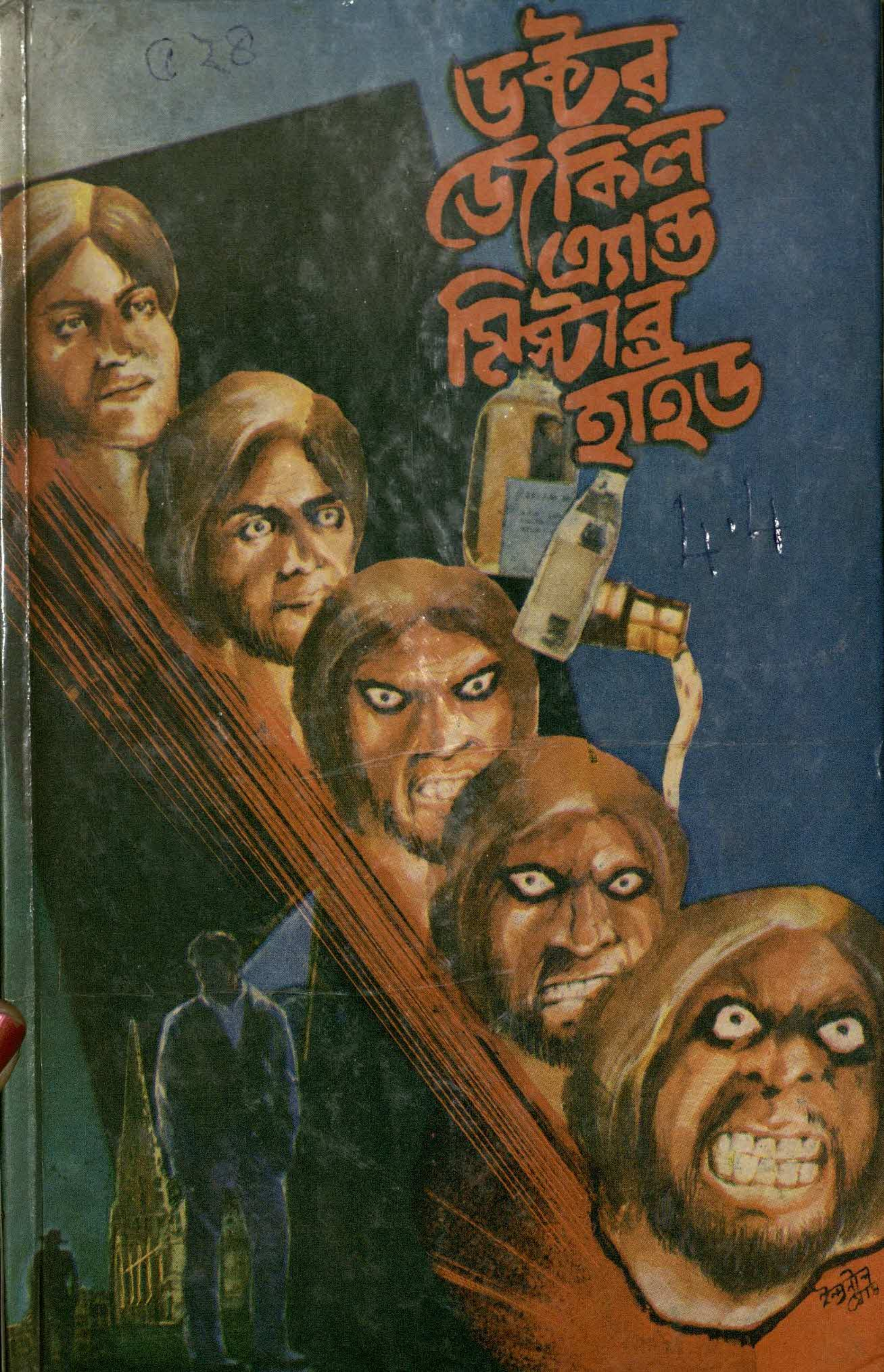

ডক্টর
জেকিল
এ্যাণ্ড
মিস্টার
হাইড

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

ডঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড

রূপান্তর

ডঃ মিলন দত্ত

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৭

প্রকাশক :

সি. ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০৭৩

মুদ্রক :

বিলাস হাজরা
মডার্ন প্রিণ্টার্স
৬১ বি শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০০৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ইন্দ্রনীল ঘোষ

মূল্য : ৮.০০

লেখক পরিচিতি

ইংরেজী সাহিত্যকে যাঁরা অসামান্য সাহিত্য প্রতিভায় উজ্জল ও বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করে রেখেছেন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন তাঁদের অন্যতম।

স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর স্টিভেনসনের জন্ম।

স্টিভেনসন বাল্যকাল থেকেই নতুনত্বের পিয়াসী। গতানুগতিক জীবনযাত্রা তাঁর কোনদিনই ভালো লাগত না। তিনি সবসময় দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার কথা ভাবতেন। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসগুলির তিনি ছিলেন মুগ্ধ পাঠক। তেরো বছর বয়সে বাবা মায়ের সঙ্গে নানা দেশ ঘুরে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা হল। সতেরো বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য ভালো করে পড়াশুনো করতে পারলেন না। অনেকটা হতাশ হয়ে যখন কি করবেন ভাবছেন, তখন তাঁর পরিচয় হল এক মহিলা অধ্যাপিকার সঙ্গে। তাঁর অনুপ্রেরণায় তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্রতী হলেন। একত্রিশ বছর বয়সে লিখলেন ট্রেজার আইল্যাণ্ড। এই বইখানা লিখেই তিনি খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন।

এরপর একে একে লিখলেন প্রিন্স অটো, ডঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড, কিডন্যাপড, দি ব্ল্যাক অ্যারো, দি বটল ইমপ প্রভৃতি বই। স্টিভেনসন হলেন জনপ্রিয় সাহিত্যিক।

'ডঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড' বইটি লিখে স্টিভেনসন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই বইটি থেকে মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ তত্ত্বই প্রচারিত হয়ে গেল—ডঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড নামে। একই মানুষের মধ্যে থাকে দুটি সত্তা—একটি সত্তা চেতন, অন্যটি অচেতন। চেতন সত্তাটি সুন্দর সুস্থ সুশ্রী। এর দ্বারা হতে পারে ভালো ভালো কাজ। অচেতন সত্তাটি হল বিশ্রী, বীভৎস যার কাজ হল খুব ঘৃণ্য। এই সত্তাটি যদি কোনক্রমে জেগে ওঠে, তাহলে চেতন সত্তাটি আর ভালো ভালো কাজ করতে পারে না, এবং পরিণামে ঘটে বিপর্যয়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যে ভালো মন্দ দুটোই থাকে এই উপন্যাসে তা দেখানো হয়েছে। বইটি বিশ্বসাহিত্যের একটি অসাধারণ বই।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে স্টিভেনসনের মৃত্যু হয়।

আমাদের অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থ

ট্রেজার আইল্যাণ্ড	৮·০০
কুয়ো ভাদিস	৮·০০
অ্যাডভেঞ্চার অব টম সয়ার	৮·০০
ফ্রাঙ্কেন্‌স্টিন	৮·০০
লাস্ট ডেজ অব পম্পেই	৬·০০
অলিভার টুইষ্ট	১০·০০

ডঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড

॥ ডক্টর জেকিলের গবেষণা ॥

লণ্ডন শহরের হাইড পার্ক।

ভারী সুন্দর এই পার্কটি। চারধারে ফুলের বাগান। মাঝখান দিয়ে ছবির মতো পায়ে চলার পথ। দুপাশে বিশ্রামের জন্যে মনোরম বসার জায়গা।

সারাদিনের খাটাখাটনির পর মানুষ এই হাইড পার্কে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বিকেল হতেই এখানে এসে ভিড় করে নানা ধরনের নরনারী। এখানে আসে অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের দল দু দণ্ড নিরিবিলিতে একটু কথাবার্তা বলার জন্যে।

সেদিনও হাইড পার্ক জমজমাট। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এসে পড়েছে। পার্কের গাছপালার মধ্যে আলোছায়ার লুকোচুরি কেমন এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। একটা কোণে ঝোপের আড়ালে বেঞ্চে বসে আছে একজন যুবক আর একজন যুবতী।

দুজনের বেশভূষা বেশ সুন্দর। দেখলেই বোঝা যায় ওরা অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়ে।

যুবকের চোখ মুখের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধির ছাপ। সমস্ত চেহারায় প্রখর ব্যক্তিত্ব আর দৃঢ়তা। মেয়েটির চেহারা সুন্দর।

এই যুবকটির নাম ডাঃ জেকিল। এই বয়সেই বৈজ্ঞানিক রূপে মস্ত খ্যাতি অর্জন করেছেন। ওঁর দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় ওঁর মন পড়ে আছে ওঁর ল্যাবরেটরিতে।

ডাঃ জেকিল বারবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন দেখে ওঁর পাশে বসা মেয়েটি বলল, এসেই পালাই পালাই করছো কেন? তোমার যেন কিছু একটা হয়েছে।

ডাঃ জেকিল তাড়াতাড়ি বললেন, আমার কিছু হয়নি ফ্লোরিনা।

—না, হয়েছে কিছু একটা। ফ্লোরিনা বলল, কিছুকাল ধরে

দেখছি, তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো। আগেকার মতো আর আমার সঙ্গে বেড়াও না, ডাকলে সাড়া দাও না। সব সময় অন্যমনস্ক। মনে হয় আমাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছো।

—না-না, এ সব তোমার ভুল ধারণা। ডাঃ জেকিল হাসলেন, তোমাকে এড়িয়ে চলবো কেন।

—আমি কিছু বুঝি না ভেবেছো। ফ্লোরিনার কণ্ঠে অভিমান, আগের মতো তুমি আর আমাকে ভালোবাসো না।

—কে বললে ভালোবাসি না।

—আমি বুঝতে পারি। সেদিন তোমার বাড়িতে গেলাম। পল বলল তুমি নাকি কারো সাথে দেখা করছো না।

—তুমি কিছু মনে করো না। পলকে আমিই এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছি।

—কিন্তু কেন তুমি এরকম নির্দেশ দিয়েছো?

—সে সব কথা এখন বলা যাবে না ফ্লোরিনা, ডাঃ জেকিল বললেন, শুধু শুনে রাখো, আমি বর্তমানে এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খুব ব্যস্ত।

—বেশ, আমাকেও বলবে না তুমি।

—এ গবেষণার কথা কাউকে বলা যায় না। আর বললেও তুমি কিছু বুঝবে না।

—তুমি বুঝিয়ে বললে আমি নিশ্চয় বুঝবো।

—না। তুমি কিছু বুঝবে না।

ফ্লোরিনার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়ল। ও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল।

ফ্লোরিনার মুখের দিকে তাকিয়ে জেকিলের মনে একটু কষ্ট হল। তিনি কোমল কণ্ঠে বললেন, দ্যাখ ফ্লোরিনা, তুমি হয়তো আমার কথায় ব্যথা পেয়েছো। কিন্তু আমার এই বিজ্ঞান গবেষণার ব্যাপারে আমি যে কতখানি নিরুপায়, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলি

কি ভাবে। তুমি রাগ করো না।

ফ্লোরিনা মৃদুকণ্ঠে বলল, বেশ তো, তোমার ইচ্ছা না হলে বলো না।

জেকিল বললেন, তুমি এখনও রেগে আছো। আমি শুধু তোমাকে একথা জানিয়ে রাখছি, আমি পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজানোর জন্যে সাধনা করছি। বিজ্ঞানের প্রয়োগে আমি কুৎসিতকেও আশ্চর্য সুন্দর করে তুলবো।

—সে কি সম্ভব? ফ্লোরিনা অবাক কণ্ঠে বলল, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কারো পক্ষেই কুৎসিতকে সুন্দর করে তোলা সম্ভব না।

—আমার বিশ্বাস—সম্ভব। জেকিল জোর দিয়ে বললেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে। যা ছিল মানুষের কল্পনা, তাই এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্যে কুৎসিতকে সুন্দর করা যাবে না কেন?

—আমি বিজ্ঞানের ব্যাপার ট্যাপার বুঝি না, ফ্লোরিনা বলল, আমি শুধু বুঝি খোদার উপর খোদকারি করতে যাওয়া ঠিক না। ঈশ্বর যাকে যেমন করে গড়েছেন তাকে তেমনভাবেই থাকতে হবে।

—এযুগে বিজ্ঞান সব কিছু পাল্টে দিচ্ছে। আমিও ঈশ্বরের বিধান পাল্টে দেব। আমি এমন ওষুধ আবিষ্কার করতে চলেছি যা দিয়ে কুৎসিত মানুষকে অপূর্ব রূপবান করে তোলা সম্ভব হবে।

জেকিলের মুখের রেখায় বিশ্বাসের দীপ্তি। হঠাৎ ফ্লোরিনার মনে হল, জেকিলের এই রূপসাধনার পিছনে অন্য কোন মেয়ের প্রেরণা নেই তো? কোন কুৎসিত মেয়েকে ও হয়তো ভালোবেসেছে, আর তাকেই সুন্দর করে তোলবার সাধনায় ও আজ মগ্ন। কথাটা মনে হতেই তার মনের মধ্যে জেগে ওঠে ঈর্ষা।

ফ্লোরিনা বলল, আমার মনে হচ্ছে, তোমার এই রূপসাধনার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে।

জেকিল অবাক হয়ে বললেন, কি আবার কারণ?

ফ্লোরিনা বলল, আমি বুঝতে পারছি তুমি কোন কুৎসিত মেয়েকে

ভালোবেসেছ। তাকেই এখন তুমি সুন্দর করে তুলতে চাইছো কোন আবিষ্কারের মাধ্যমে।

জেকিল হেসে বললেন, পাগল হয়েছো। ওসব কোন ব্যাপারই না। তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছো। আমি এখন তোমাকে কিছু বলবো না, তবে পরে একদিন না একদিন তোমাকে সব খুলে বলবো। তখন সব বুঝতে পারবে।

ফ্লোরিনা বলল, তুমি এখনি আমাকে সব বলো না কেন।

জেকিল বললেন, এখনও বলার মতো সময় আসেনি। তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার এই গবেষণার কাজটা শেষ হলেই আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফেলা যাবে।

—আগে বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফেলে পরে গবেষণা করলেও তো পারবে। আমি তো তোমাকে বাধা দেব না।

—সে হয় না। জেকিল হেসে বললেন, আমি গবেষণার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়েছি। এটা বড় কঠিন সময়। হঠাৎ এমন কিছু ঘটে যেতে পারে যাতে আমার জীবনের উপর নেমে আসবে যবনিকা।

ফ্লোরিনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, তুমি বলছো কি। এ কিসের গবেষণা করছো তুমি। যদি তোমার জীবনের ভয় থাকে, তবে বন্ধ করো ও গবেষণা।

—এখন আর বন্ধ করা যায় না ফ্লোরিনা। আমি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি। এখন আর পিছনে যাবার পথ নেই।

—না, এ গবেষণা আমি তোমাকে করতে দেবো না।

—গবেষণা কারো ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে এগিয়ে যায় না ফ্লোরিনা। জেকিল গম্ভীর মুখে বললেন, গবেষণা চলে তার নিজের ইচ্ছেয়—নিজের পথে। তুমি কেন, আমার নিজেরও ক্ষমতা নেই একে আমি বন্ধ রাখি। গবেষণাই আমাকে ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নেবে।

—কিন্তু তুমি বলছো জীবনের ভয় আছে।

—বিশ্বের সব বড় বড় আবিষ্কারই তো বৈজ্ঞানিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। জীবনের ঝুঁকি না নিলে কি সভ্যতা এত এগিয়ে যেতে পারতো।

—তা হোক। তুমি এ কাজ করতে পারবে না।

—পাগলামি করো না লক্ষ্মীটি। জেকিল ফ্লোরিনার হাতে চাপ দেন, কোন চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। চল এবার ফেরা যাক।

ওরা উঠে পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে এবার যে যার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

॥ বাঘ-বেড়াল ? না দানব-বেড়াল ? ॥

ডক্টর ব্রাউন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান জগতে তাঁর নাম ডাক প্রচুর। বার্ক শহরে তিনি গিয়েছিলেন দরকারী কাজে। কাজ শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল।

মোটরে করে লণ্ডনে ফিরে আসছিলেন তিনি। হোয়াইট হর্স পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। রাতের দিকে জায়গাটা বেশ নির্জন হয়ে যায়।

জঙ্গলের পথে মোটরটা গোঁ গোঁ গর্জন করে চলেছে। দু পাশে বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে দানবের মতো।

ডক্টর ব্রাউন স্টিয়ারিং ধরে বসেছিলেন। মোটরের হেড লাইট পথের উপর পড়ে কি রকম রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ ডক্টর ব্রাউন চমকে উঠলেন। পাশের জঙ্গল থেকে একটা বড়সড় বাঘ বেরিয়ে আসছে। ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন ব্রাউন। এখানে বাঘ আসবে কি করে। এখানে তো কোনদিন বাঘ ছিল না।

মোটর ততক্ষণে বেশ কাছে এসে পড়েছে। আর ব্রাউন এবার কাছ থেকে ওটাকে দেখে আরও অবাক হলেন। এটা তো বাঘ

নয়। বাঘের কি এত লম্বা লম্বা হাতির মতো দাঁত থাকে ?

এ জন্তুটার মুখের দুদিক থেকে প্রায় এক ফুট লম্বা দুটো দাঁত



বেরিয়ে এসেছে।

ডক্টর ব্রাউনের শরীরে যেন শিহরণ জাগল। তিনি ব্রেক চেপে গাড়ী থামালেন। পিস্তলটা হাতে তুলে নিলেন।

জন্তুটা গাড়ীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে নেমে আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

ডক্টর ব্রাউনের হাত কাঁপছিল, তিনি গাড়ী স্টার্ট দিয়ে ঝড়ের বেগে চললেন লণ্ডনের পাণে।

পরদিন বেলা দশটার সময় চলে গেলেন সরকারী জুওলোজিক্যাল অফিসে। নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিলেন ডিরেক্টরের কাছে। ডিরেক্টর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ডক্টর ব্রাউন ঢুকতেই ডিরেক্টর উঠে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, বলুন ডক্টর ব্রাউন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি।

—আমি আপনার কাছে একটি অদ্ভুত জন্তু সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

—কি ধরনের জন্তু?

—অনেকটা বাঘের মতো দেখতে—অথচ বাঘও নয়—বাঘের চেয়ে বরঞ্চ বেড়ালের সঙ্গেই মিল বেশী। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মুখের ভিতর দিয়ে হাতির দাঁতের মতো দুটো দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

—অসম্ভব। এ ধরনের কোন প্রাণী থাকতে পারে না।

—আমি নিজের চোখে দেখেছি, মিস্টার ডিরেক্টর।

—আপনি নিজের চোখে দেখেছেন! আশ্চর্য কাণ্ড। কিন্তু বাঘের মতো দেখতে, অথচ বাঘ নয়, অনেকটা বেড়াল বেড়াল আবার মুখের ভিতর থেকে দুটো দাঁত বেরিয়ে এসেছে—স্ট্রেঞ্জ—এ ধরনের কোন জন্তু জীবজগতে আছে বলে তো আমার জানা নেই।

—তাহলে কি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?

—আমি দুঃখিত মিস্টার ব্রাউন, ডিরেক্টর বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন কথা নয়। আসলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

—ঠিক আছে। আপনি বলছেন, জীবজগতে এই ধরনের প্রাণীর কোন অস্তিত্ব নেই। আমি প্রমাণ করে দেবো—আছে।

—সেদিন আমিই সবচেয়ে খুশী হবো।

মিস্টার ব্রাউন এরপর বিদায় নিয়ে চলে এলেন নিজের বাড়িতে।

ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এনফিল্ড বসে আছেন তাঁর অপেক্ষায়।

ব্রাউনকে দেখেই এনফিল্ড ব্যস্তভাবে বললেন, উঃ। এত দেরী তোমার। কোথায় গিয়েছিলে?

—আর বলো না। ব্রাউন ব্যাজার মুখে বললেন, গিয়েছিলাম আমাদের সরকারী জুলজিক্যাল অফিসে একটা বিষয় জানতে। তা ওখানকার ডিরেক্টরটা এমন মহামূর্খ—

—ব্যাপারটা কি।

—ব্যাপারটা হচ্ছে ওর পরিচিত প্রাণীকুলের বাইরে যে আরো অপরিচিত প্রাণী এখনও থাকতে পারে, তা ওকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো গেল না। লম্বা দাঁতওয়ালা বেড়াল—

—লম্বা দাঁতওয়ালা বেড়াল! এনফিল্ড উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন, লম্বা দাঁতওয়ালা বেড়াল তুমি কোথায় দেখলে?

—ওটা আমি দেখেছি হোয়াইট হর্স পাহাড়ের পাশে জঙ্গলে। এই বলে ব্রাউন তাঁর গতরাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। ব্রাউনের কাহিনী শোনবার পর এনফিল্ড বললেন, আরে আমিও তো তোমার কাছে ওই দাঁতওয়ালা বেড়ালের কথা বলবার জন্যেই বসে আছি।

—বটে! বলো দেখি তোমার কাহিনীটা। ব্রাউন প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকালেন।

—এটা ঠিক আমার কাহিনী নয়, আমার এক আত্মীয়ের। তিনি থাকেন বার্ক জেলায়। তাঁর বাড়ির চাকরটা যখন পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন একটা অদ্ভুত জন্তু তার উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তার চিৎকারে লোকজন ছুটে আসে। মৃত্যুর আগে সে বলে যায় সাধারণ বেড়ালের চেয়ে একশো গুণ বড়ো একটি বেড়াল নাকি তার উপর লাফিয়ে পড়ে তার এই দশা করেছিল। বেড়ালের দুটো দাঁতের কথাও সে বলে গেছে।

—চাকরটা মারা গেছে তাহলে?

—হ্যাঁ, বিষাক্ত ক্ষতে তার মৃত্যু হয়েছে।

—আশ্চর্য। আমি যে জন্তুটা দেখেছি, তার সাথে এটার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে।

—কিন্তু জন্তুটা আসলে কি?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ব্রাউন বললেন, আমার ধারণা, ওটা বেড়ালের কোন প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন।

—অসম্ভব। বেড়ালের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন সেই কবে ডাইনোসোরসের যুগেই শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক যুগে এসব চিন্তাও পাগলামি—বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের মতো এত আধুনিক দেশে।

—তাহলে কি ওটা বাঘ-বেড়াল—কিংবা দাঁতাল বেড়াল? সে যাই হোক না, আমি ঠিক করেছি, আমি ওটাকে আবার খুঁজে বের করবো এবং সম্ভব হলে ধরবারও চেষ্টা করবো।

—আমিও তাহলে তোমার সাথে যাবো। এনফিল্ড বললেন, আশা করি আমাকে সঙ্গে নিতে তোমার আপত্তি হবে না।

—আপত্তি কিসের। ব্রাউন বললেন, তুমি সঙ্গে গেলে তো ভালই হয়। তুমি পাকা শিকারী। আমাকে সব দিক দিয়েই সাহায্য করতে পারবে।

—আমি তাহলে বাড়ি চলে যাচ্ছি। শিকারের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করে নিই। এদিকে তুমিও যা যা নেবার জোগাড় করে প্রস্তুত হয়ে থেকো। কাল ভোরেই আমরা যাত্রা করবো।

—ঠিক আছে। ওটাকে ধরবার সাজসরঞ্জাম আমি আজকের মধ্যেই জোগাড় করে রাখছি। তুমি কাল খুব সকালেই এখানে চলে এসো।

॥ এবার বন্দী ॥

পরদিন মোটরে ব্রাউন আর এনফিল্ড রওনা হলেন হোয়াইট হর্স পাহাড়ের উদ্দেশে। সঙ্গে জর্জ—ব্রাউনের ভৃত্য।

গাড়ীর মধ্যে শিকরের যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম। রাইফেল গুলি টর্চ আর টেনিস খেলার দুটি জাল। এনফিল্ড অবাক হয়ে বললেন, টেনিস খেলার জাল দিয়ে কি হবে? আমরা কি জঙ্গলের মধ্যে টেনিস খেলতে যাচ্ছি নাকি?

ব্রাউন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না-না, তা নয়, আসলে ওই জাল দিয়ে সেই অদ্ভুত জীবটাকে ধরবো কিনা।

—জীবজন্তু ধরবার জাল তো আলাদা।

—তা সত্যি। তবে এই অল্প সময়ের মধ্যে সেটা আর জোগাড় হল কোথায়?

—যাক্ তবু মন্দের ভাল। ভাগ্যিস মাছ ধরার জাল আনোনি। এনফিল্ড হেসে বললেন।

হোয়াইট হর্স পাহাড়ের কোণ ঘেঁষে গাড়ী দুটো রাখা হল। দুদিকে পাহাড় আর বিশাল বিশাল গাছের জঙ্গল। মাঝখান থেকে রাস্তা। গাড়ী দুটো এক পাশে রেখে ভ্যানগাড়ীর ড্রাইভারের সাহায্য নিয়ে জাল দুটো টেনে নামানো হল। তারপর চার জনে মিলে ও দুটো নিয়ে জাল পাতবার মতো জায়গার খোঁজ করতে লাগলেন।

সব জায়গায় জাল পাতা যায় না।

এমন জায়গায় জাল দুটো পাততে হবে যেখানে জানোয়ারটা তাড়া খেয়ে দৌড়ে এসে জালের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল সে রকম জায়গা। একটা জাল টান টান করে পেতে আর একটা জাল কাছাকাছি রেখে ওরা ফিরে এলেন গাড়ীর কাছে।

সন্ধ্যার আবছা আঁধার চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে। শহরাঞ্চলে এ আঁধার কিছুই না, কিন্তু জঙ্গলের গাছগুলোর উপর এ আঁধার ইতিমধ্যেই রহস্যের একটা মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছে।

ওরা রাতের খাওয়া শেষ করে গুলিভরা রাইফেল আর জোরালো টর্চ নিয়ে সেই জালের কাছে চলে এলেন।

ব্রাউন জর্জ আর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা

তাহলে পাহাড়ী সরু পথটা ধরে উপরে চলে যাও। আমরা ওই গাছটার উপর বসে থাকবো। জানোয়ারটাকে দেখতে পেলেই টর্চের আলো ফেলবো। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করবে।

—জানোয়ারটা যদি জালের দিকে না যেয়ে অন্য দিকে দৌড় দেয়?

—না, তা দেবে না। অন্য দিকে খাদ। খাদের মধ্যে কখনোই ওটা লাফ দেবে না। তবে কোন অবস্থাতেই কিন্তু গুলি ছুড়বে না ওর দিকে।

—ঠিক আছে স্যার।

জর্জ আর ড্রাইভার পাশের সরু পাকদণ্ডী বেয়ে উপরে উঠে গেল।

ব্রাউন এনফিল্ডকে নিয়ে জালের পাশে একটা ছোট গাছের ডালে বসে রইলেন।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে দু চারটে বুনো জীব বেরিয়ে এদিক ওদিক ছুটে গেল। গাছের ডালের উপর বেশীক্ষণ বসে থাকা মুস্কিল। তবু ধৈর্য ধরে বসে রইলেন ওরা।

মাঝরাতে হঠাৎ গাছের পাখিরা পাখা ঝাপটাতে লাগল। দুচারটে পাখি মুখ দিয়ে শব্দ করে চক্রাকারে উড়তে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সাদা খরগোস তীর বেগে ছুটে পালাল।

ব্রাউন এনফিল্ডের হাতে মৃদু চাপ দিলেন। পাহাড়ের উপর থেকে সাদা বাঘের মতো একটা জন্তু নেমে আসছে।

এনফিল্ড হাতের টর্চের সুইচ টিপতে যেতে ব্রাউন বাধা দিলেন। ফিস ফিস করে বললেন, আরো নেমে আসতে দাও।

সেই জীবটা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল। প্রায় ছোটখাটো হাতির বাচ্চার মতো। জালটার দুশো গজের মধ্যে আসতেই ব্রাউন টর্চের বোতাম টিপলেন। তীব্র আলোর রেখায় জন্তুটার সারা শরীর স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল গর্জে উঠল—গুড়ুম—গুড়ুম—জঙ্গলের

শান্ত নির্জনতা সেই শব্দে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। গাছের ঘুমন্ত পাখীরা নানা ধরনের শব্দ করতে করতে ডানা ঝাপটাতে লাগল।

আর সেই জানোয়ারটা তীব্র বেগে নীচের দিকে নেমে এসে জালে জড়িয়ে গেল। আর তারপর কি লাফানি ঝাঁপানি। আর বিকট ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ। লাফানোর চোটে জালটা যেন ছিঁড়ে ফেলবে। ব্রাউন এনফিল্ডের সাহায্যে এবার অন্য জালটাও ওই জীবটার মাথার উপর ছুঁড়ে দিলেন। জানোয়ারটা এবার পুরোপুরি বন্দী হল।

ইতিমধ্যে জর্জ আর ড্রাইভার উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে।

সবাই মিলে সেই জালটার চারদিকে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল। জানোয়ারটা ততক্ষণে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়েছে। সেই অবস্থায় ওটাকে টানতে টানতে নিয়ে এসে অনেক মেহনত করে ভ্যান গাড়ীতে তোলা হল, তারপর গাড়ী তীব্র বেগে ছুটে চলল লণ্ডনের দিকে। ব্রাউনের চোখে মুখে খুশির আলো।

॥ চিড়িয়াখানায় প্রেস কন্‌ফারেন্স ॥

পরদিন লণ্ডন শহরের চিড়িয়াখানায় দারুণ ভিড়। বাচ্চাদের ভিড় নয়, বড়দের ভিড়। বিদ্বান জ্ঞানীগুণী মানুষরা এসেছেন। চিড়িয়াখানায় একটা অদ্ভুত জন্তু আনা হয়েছে। এই ধরনের জন্তু এর আগে কেউ ত্যাখেনি। প্রতিটি খবরের কাগজের রিপোর্টার হাজির। সঙ্গে ফটোগ্রাফার। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিস্টার ব্রাউন প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন। তিনি ওই অদ্ভুত জন্তুটির বিবরণ দেবেন।

বিশাল একটা খাঁচার মধ্যে জন্তুটাকে রাখা হয়েছে। দলে দলে লোক গিয়ে দেখে আসছে। দেখে সকলেরই চোখ ছানা বড়া। এ

আবার কেমন জন্তু রে বাবা। দেখতে অনেকটা বেড়ালের মতো। বেড়ালের মতো গোঁফ চোখ নাক কান। অথচ বেড়াল নয়। বেড়ালের অন্তত দশগুণ বড়ো। একটা বেড়ালকে কোন কায়দায় বেলুনের মতো ফুলিয়ে ফেললে যে চেহারা হয়, এই জন্তুটার চেহারাটাও অনেকটা সেই ধরনের।

চারধারে এত লোকজন দেখে জন্তুটা রেগে লম্ফ ঝম্ফ করছে আর মুখ দিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ আওয়াজ করছে। রিপোর্টারদের ফ্ল্যাশগানের আলোতে জন্তুটার রাগ আরও বেড়ে যাচ্ছে।

একবার তো একজন অধ্যাপকের টাইটায় থাবা মেরেছিল আর কি।

অধ্যাপকটি 'বাপরে' বলে সভয়ে পিছিয়ে গেলেন। জন্তুটাকে দেখে নানান জনে নানান মন্তব্য করছেন। কেউ বলছেন, এটা হল বাঘের পূর্বপুরুষ।

কেউ বলছেন, এটা প্রাগৈতিহাসিক বেড়ালের শেষ বংশধর। কোথাও কোন বরফের দেশে ছিল। পথ ভুলে এদিকে চলে এসেছে।

রিপোর্টিং রুমে তখন দারুণ উত্তেজনা।

ডক্টর ব্রাউন গুরুগম্ভীর ভাষণ দিয়ে বললেন, বিশ্বের অসংখ্য স্মরণীয় আবিষ্কারের মতো এই জন্তুটির আবিষ্কারও অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই হয়েছে। কিভাবে এটির আবিষ্কার হল, তা তিনি বর্ণনা করলেন।

ডক্টর ব্রাউনের বলার পর ভাষণ দিতে উঠলেন আর এক দিক-পাল অধ্যাপক। তিনি এই আবিষ্কারকে যুগান্তকারী আখ্যা দিয়ে আবিষ্কৃত জন্তুটাকে কি এক লুপ্তপ্রায় জীবের বংশধর হিসাবে তাকে সনাক্ত করলেন। এটির জোড়া আর একটি মাত্র আছে নাকি হিমালয়ের কোন তুষারাবৃত দুর্গম শীর্ষে। লণ্ডনের এক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি এই জন্তুর উপর তার একটি সচিত্র গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হবে।

পরদিন সারা লণ্ডন শহরেই দারুণ হৈ চৈ। সব কটি দৈনিক

সংবাদপত্রে এই অদ্ভুত জন্তুর সচিত্র বিবরণ। অদ্ভুত অদ্ভুত সব হেডিং দিয়ে রোমাঞ্চকর সব কাহিনী ছাপা হয়েছে এই জন্তুটাকে নিয়ে।

সেই সব কাহিনী পড়ে ডক্টর ব্রাউনও হতভম্ব হয়ে গেলেন। রাতারাতি তিনি হয়ে গেলেন রূপকথার নায়ক। আর এদিকে চিড়িয়াখানার ভিড় সামাল দিতে কর্তৃপক্ষের প্রাণান্তকর অবস্থা।

সারা লণ্ডন শহর তখন চিড়িয়াখানার মধ্যে।

॥ বেড়ালের রহস্যভেদ ॥

দিন তিনেক পরে ডক্টর ব্রাউন চিড়িয়াখানা থেকে জরুরী ফোন পেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে চলে গেলেন।

চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। সঙ্গে আরো কয়েকজন পদস্থ অফিসার।

—কি ব্যাপার মিস্টার ডিরেক্টর? উদ্বিগ্ন মুখে ডক্টর ব্রাউন বললেন, জরুরী ফোন কেন?

—চলুন দেখবেন। ডিরেক্টর গম্ভীরমুখে বললেন, এদিকে মহা অনর্থ ঘটে গেছে।

—কি হয়েছে?

—সেই জন্তুটা হঠাৎ মারা গেছে।

—মারা গেছে! ডক্টর ব্রাউন থেমে পড়লেন, কি করে মারা গেল?

—কি করে মারা গেল, সেটা পরে শুনবেন। আগে দয়া করে জন্তুটা দেখুন।

ওঁরা সকলে সেই খাঁচাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে একটা সাধারণ বেড়ালের মৃতদেহ পড়ে আছে।

—এটা কি? ডক্টর ব্রাউন চিৎকার করে উঠলেন, এটা তো একটা সাধারণ বেড়াল। সেই জন্তুটা কোথায় গেল?

—সেটাই এই জন্ত। ডিরেক্টর গম্ভীর মুখে বললেন, আপনাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেই বিশাল জন্তুটাই মারা যাবার পর এই সাধারণ একটা বেড়াল হয়ে গেছে।

—এটা একটা অসম্ভব কথা বলছেন। ব্রাউন এবার হো হো করে হেসে উঠলেন, এমনটি কখনো ঘটতে পারে না।

—যা ঘটেছে, তাই আপনাকে বলছি।

—অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, সেই জন্তুটাকে যে কোন কারণেই হোক মেরে ফেলা হয়েছে, আর তার জায়গায় এটি রেখে দেওয়া হয়েছে।

—ডক্টর ব্রাউন, বৈজ্ঞানিক হিসাবে আপনাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, ডিরেক্টর গম্ভীর মুখে বললেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনার এই মন্তব্যের আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেই জন্তুটাকে কেউ মারেনি। কাল সন্ধ্যাবেলা তাকে যথারীতি মাংস দেওয়া হয়েছিল খাবার জন্যে। সে সেটা স্পর্শও করে নি। আমার লোকজন খাওয়াবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। না খাওয়ার ফলে ওর জীবনী শক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

—না খাওয়ার ফলে মানে? ব্রাউন অবাক হয়ে বললেন, ওই জন্তুটা কি একদিন না খেয়ে ছিল নাকি?

—এক রকম তাই। আনবার পর থেকেই ওর সামনে প্রচুর পরিমাণে মাংস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাংসও সে খায়নি। শুধু জল খেত মাঝে মাঝে।

—মাংস যখন খেল না, তখন অন্য কিছু দিলে পারতেন।

—কি আর দেব। ওই বাঘের মতো জন্তুকে মাংস ছাড়া কি আর দেওয়া যায়। ওই ধরনের জন্তুকে মাংস দেওয়াটাই নিয়ম। যা হোক কাল রাত্তিরেও মাংস স্পর্শ করেনি শুনে আজ সকালে আমি নিজে গেলাম ওকে দেখতে। তখনও নির্জীব হয়ে শুয়েছিল। আমাদের ডাক্তারবাবু চেষ্টা করেছিলেন ওকে চাঙ্গা করে তুলতে। কিন্তু হঠাৎ জন্তুটা লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল। আর তারপরই

অবাক কাণ্ড বেলুনে খোঁচা মারলে বেলুন যেমন চুপসে এইটুকু হয়ে যায়, ওটাও তেমনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ছোট হয়ে গেল।

শুনতে শুনতে ডক্টর ব্রাউনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। এতক্ষণে তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠেছে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। বিশাল একটা জন্তু মৃত্যুর পর বেলুনের মতো চুপসে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর জীবের রূপান্তর ঘটে, কিন্তু সে সামান্য একটু। দেহটা শক্ত হয়ে যায়, চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে এতখানি? এটা অসম্ভব। কোন জীবজন্তুরই মৃত্যুর পর এত অস্বাভাবিক পরিবর্তন হতে পারে না।

ডক্টর ব্রাউন উলটো দিক থেকে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করলেন। বেলুন প্রথম অবস্থায় থাকে ছোট। সেটাকে ফুলিয়ে বড় করা যায়। আবার পিনের খোঁচায় বেলুনটা চুপসে ছোট হয়ে যায়। তাহলে কি এই জন্তুটা প্রথম অবস্থায় ছোট একটা বেড়ালই ছিল! কেউ এটাকে কোন যান্ত্রিক কৌশলে কিংবা ওষুধ প্রয়োগে ফুলিয়ে বড় করে তুলেছিল? তারপর কোন কারণে এটার মৃত্যু হতে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছে?

বেলুনের ক্ষেত্রে যা সম্ভব, একটা জ্যান্ত জীবের ক্ষেত্রেও তা কি সম্ভব? এই মরা জীবটাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

ডক্টর ব্রাউন ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার ডিরেক্টর এই মৃত জন্তুটাকে আমি আমার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে চাই।

—কেন? এটা নিয়ে কি করবেন?

—আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকত্ব আছে।

—কি ধরনের অস্বাভাবিকত্ব?

—আমার মনে হচ্ছে, একটা সাধারণ বেড়াল কিংবা বেড়াল জাতীয় প্রাণীকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এই কিম্ভুতকিমাকার রূপ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এটা আমার অনুমান। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার

মাধ্যমেই এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর এবং অন্যান্য কয়েকজন অফিসার এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলেন।

এবার একজন অফিসার অবাক কণ্ঠে বললেন, কৃত্রিম উপায়ে জীবদেহ অন্তত দশগুণ ফোলানো যায়, প্রাণিতত্ত্বে তো কথনো একথা পড়িনি।

—আমরা যা পড়িনি, জগতে তো তাও হামেশাই ঘটছে। ডক্টর ব্রাউন হেসে বললেন, এবার খাঁচার দরজাটা দয়া করে খুলে দিন। আমি একটু কাছ থেকে দেখবো।

খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হল। ডক্টর ব্রাউন খাঁচার মধ্যে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসে একটা লাঠির সাহায্যে জন্তুটাকে উল্টিয়ে ফেললেন।

জন্তুটার লোম ধরে টানতেই এক গোছা লোম উঠে এল।

সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর ব্রাউনের মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া ঘনাল। অস্ফুট কণ্ঠে—বললেন, ভারী আশ্চর্য, অসাধারণ একটা ঘটনা।

খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তাহলে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা হবে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু কে সেই বৈজ্ঞানিক যিনি খোদার উপর নির্জনে বসে খোদকারি করে চলেছেন? যা হোক, জন্তুটাকে আমার গাড়ীতে তুলে দিন দয়া করে।

॥ ডক্টর ব্রাউনের গবেষণা ॥

পরদিন আবার লণ্ডনের প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রে সেই মরা বেড়ালের সচিত্র কাহিনী।

আর সেই সঙ্গে ডক্টর ব্রাউনের মন্তব্য।

কোন কাগজওয়ালাই সঠিক ঘটনাটি ছাপে না। সঠিক ঘটনাটির উপর নানা রকমের রঙ চড়িয়ে এক একটা গল্প বানিয়ে পরিবেশন

করলে পাঠক পাঠিকা সেগুলি গোগ্রাসে গেলে। এই নিয়ে আবার বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, কে কত ভালো গল্প বানাতে পারে।

মরা বেড়াল নিয়ে লণ্ডনের কাগজগুলো দারুণ সোরগোল তুলে ফেলল। আর তার ফলে ডক্টর ব্রাউনের বাড়িতে সাংবাদিকদের ছুটোছুটি পড়ে গেল।

ডক্টর ব্রাউন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

মরা বেড়ালটাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এসে তিনি সেটাকে ভালো করে পরীক্ষা করেছেন। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে একটা বেড়ালকে রাসায়নিক পরীক্ষায় বাঘের মতো ফুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবটা কেটে যেতেই সে আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পেয়েছে। যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই ব্যাপারটি ঘটানো হয়েছে, তাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। কারণ এই বিষয়টি তাঁরই সাবজেক্ট। প্রাণিতত্ত্ব ও রসায়নতত্ত্ব দুটো বিভাগেই তাঁর দারুণ পাণ্ডিত্য। তিনিও এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। সুতরাং ব্যাপারটি ধরতে তাঁর বিশেষ দেরী হয়নি। সাংবাদিকদেরও তিনি একই কথা বললেন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ডক্টর, পশু-পাখির মধ্যে যদি এ রকম রূপান্তর আনা সম্ভব, তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে কি এটা সম্ভব?

—মানুষ আর পশু-পাখির ব্যাপারটা অনেকটা আলাদা। পশু-পাখির ক্ষেত্রে তাদের দেহের ব্যাপারটাই প্রধান, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে দেহ ছাড়াও মনের ব্যাপার আছে। মানুষের দেহের চেয়েও মনের শক্তি অনেক বেশী। কাজেই এ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করার আছে।

—আপনি কি চিন্তা করছেন কিছু?

—না, আমি এসব নিয়ে চিন্তা করি না। ভগবান মানুষকে বা জীবকেও যেভাবে গড়েছেন, সে সেইভাবেই থাকুক। খোদার

উপর খোদকারি করতে গেলে পরিণতি অশুভ তা আমি জানি।

—এই বিষয়টা নিয়ে অন্য কেউ গবেষণা করছেন কি?

—করতে পারেন, কিংবা নাও করতে পারেন। আমি কোন খবর রাখি না।

সাংবাদিকদের আরও অনেক কিছু জানার ছিল। কিন্তু ডক্টর ব্রাউন আর এসব নিয়ে আলোচনা করতে চাইলেন না।

সাংবাদিকরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে এবার ঢুকলেন ডক্টর জেকিল।

জেকিলকে দেখে ব্রাউন খুব খুশি হলেন। জেকিল তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এখন নিজেই মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানে অনেকগুলি ডিগ্রি লাভ করেছে। কৃতী ছাত্র অধ্যাপকের গৌরব।

জেকিলকে দেখে বললেন, আরে এসো এসো। সকাল থেকে সাংবাদিকদের অত্যাচারে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়।

—কাগজে আপনার কথা নিয়ে অনেক লেখালিখি হচ্ছে। ডক্টর জেকিল বললেন, আমিও তাই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু জানতে এলাম।

—আরে। কাগজগুলো তো আজেবাজে গল্প তৈরী করছে। ওসব নিয়ে আবার জানবার কি আছে?

—অনেক কিছুই জানার আছে স্যার। জীবদেহে রূপান্তর সম্পর্কিত গবেষণার প্রথম সূত্রটি তো স্যার আপনার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। আপনি তো জানেন, এ বিষয়ে আমারও যথেষ্ট আগ্রহ আছে।

ডক্টর ব্রাউন বললেন, ছ্যাখো কি প্রক্রিয়ায় জীবদেহে এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তা আমি ধরতে পেরেছি। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়ার যে ত্রুটিগুলো আছে, সেগুলিও আমি খুঁজে বের করেছি। তুমি বৈজ্ঞানিক। তোমার সঙ্গে এগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। তোমায় আমি দেখাচ্ছি সব।

এই বলে ডক্টর ব্রাউন জেকিলকে নিয়ে গেলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে। আলমারীর মধ্যে কাগজপত্র সাজানো। প্রতিটি কাগজে

গবেষণা সম্পর্কিত নানা তথ্য। গোছা গোছা ফটোগ্রাফ।

ডক্টর জেকিল তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর এই বৃদ্ধ শিক্ষক এই বিষয়টি নিয়ে সত্যি অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গবেষণা শেষ হতে আপনার আর কত দেরী হবে স্যার?

—আশা তো করছি, খুব শীঘ্রই শেষ করতে পারবো।

—গবেষণা শেষ হলে কি করবেন স্যার?

—কেন সব বৈজ্ঞানিক যা করেন, তাই করবো। ডক্টর ব্রাউন বললেন, রয়্যাল সোসাইটির সদস্যদের সামনে আমার এই গবেষণার ফলাফল পেশ করবো। আমার এই গবেষণার সূত্র ধরে ভবিষ্যতে আরো অনেকে অনেক কিছু করতে পারবেন।

শুনতে শুনতে ডক্টর জেকিলের মুখটা কেমন মলিন হয়ে গেল। তিনি শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বললেন, তাহলে আজ চলি স্যার।

ডক্টর ব্রাউন হেসে হাত নাড়লেন, আবার দেখা হবে।

॥ ডক্টর জেকিলের উইল ॥

মিষ্টার অ্যাটার্সন লণ্ডন শহরের নামকরা অ্যাটর্নি।

মানুষটাকে বাইরে থেকে দেখতে কাঠখোট্টা রুক্ষভাষী, কিন্তু ভিতরটা খুব কোমল। দায়ে বেদায়ে বন্ধুদের তিনি উপকার করেন। তাঁর এই উপকারের পিছনে কোন স্বার্থবুদ্ধি নেই। বন্ধুদের ভালোবাসেন বলেই তাদের উপকার করতে চেষ্টা করেন। বন্ধুরা তাঁর এই স্বভাবের কথা জানে।

সেদিন সকালে মিষ্টার অ্যাটার্সন চেম্বারে বসে একটা মামলার কাগজপত্র দেখছিলেন।

সে সময় ভৃত্য এসে খবর দিল, ডক্টর জেকিল দেখা করতে

এসেছেন।

অ্যাটার্সন নিজেই উঠে গিয়ে ডক্টর জেকিলকে অভ্যর্থনা জানালেন, আরে এসো, এসো। অনেকদিন তোমার দেখা নেই। ব্যাপার কি বলো তো ?

—গবেষণার কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। জেকিল বললেন, শোন, আমি একটা বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি।

—আইনজীবীদের কাছে বৈজ্ঞানিকদের আবার কি কাজ থাকতে পারে ? অ্যাটার্সন হেসে বললেন, তোমরা হচ্ছো সমস্ত আইনের ঊর্ধ্বে।

—না, ঠাট্টা নয়, শোন, আমি একটা উইল করেছি, সেটায় তোমায় সাক্ষী হতে হবে, আর রেজেষ্ট্রিশনেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

—তুমি উইল করেছো ? অ্যাটার্সন অবাক কণ্ঠে বললেন, তোমার কি উইল করবার মতো বয়েস হয়েছে নাকি ? তুমি তো এখন পর্যন্ত একটা বিয়েই করতে পারলে না। ঘরনেই, সংসারনেই, উত্তরাধিকারী নেই, কার জন্যে উইল করবে !

—করব আমার এক বন্ধুর জন্যে। বন্ধুটির নাম হল মিষ্টার এডওয়ার্ড হাইড। এই হাইডের জন্যই আমি একটা উইল করেছি। পড়ে ছাখো উইলটা। এই বলে জেকিল টাইপ করা উইলটা অ্যাটার্সনের হাতে দিলেন।

মিষ্টার অ্যাটার্সন উইলটা পড়লেন···

আমি ডক্টর হেনরি জেকিল এই দানপত্র দ্বারা আমার মৃত্যুর পর আমার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমার বন্ধু মিষ্টার এডওয়ার্ড হাইডকে দান করে যাচ্ছি। কোন কারণে আমি নিরুদ্দিষ্ট হলে এবং একমাসের মধ্যে আমার কোন সংবাদ না পাওয়া গেলে তিনি এই সম্পত্তির অধিকার লাভ করবেন।

স্বাঃ ডক্টর হেনরি জেকিল।

পড়তে পড়তে অ্যাটার্সনের চোখ গোল হয়ে গেল। চশমার মধ্যে দিয়ে জুলজুল করে তাকিয়ে বললেন, হুম্‌। এই এডওয়ার্ড হাইডটি কে?

—আমার এক বন্ধু।

—ছ্যাখো জেকিল, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তোমার বন্ধুদের সব আমি চিনি। হাইড নামে তোমার কোন বন্ধু আছে বলে তো আমার জানা নেই।

—তোমার যদি ধারণা হয়, আমার সব বন্ধুদের তুমি চিনে বসে আছো, তাহলে বলছি, তোমার ধারণা ভুল। জেকিল বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বরে বললেন।

—বেশ, আমার ধারণা ভুল হতে পারে, এখন বলো তো এই হাইড লোকটি কে? তোমার কতদিনের বন্ধু?

—বেশীদিনের বন্ধু না।

—বেশীদিনের বন্ধু না, অথচ তাকেই তুমি তোমার যাবতীয় সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যাচ্ছো! ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো।

—এর মধ্যে আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার সম্পত্তি আমি টম ডিক হ্যারী যাকে খুশি দিই না কেন, কার কি বলবার আছে।

—তা বলবার নেই, কিন্তু এই উইল করে তুমি যে নিজের কবর নিজেই খুঁড়ে রাখছো।

—কি করে নিজের কবর খুঁড়ছি?

—যদি এই মিষ্টার হাইড কোনমতে তোমাকে সরিয়ে ফেলতে পারে, তাহলেই তো তোমার সম্পত্তি তার অধিকারে এসে যাবে।

—আমি তো স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে তাকেই সব দিয়ে যাচ্ছি।

—সে তো তোমার অবর্তমানে। তুমি বেঁচে থাকতেও তো সে এই চেষ্টা করতে পারে। না…না…আমি তোমাকে এ উইল করতে দেবো না।

—তুমি যদি এ উইল না করো, আমি তাহলে অন্য অ্যাটর্নির কাছে গিয়ে এ উইল করাবো।

—তুমি তাহলে এ উইল করতে মনস্থির করে ফেলেছো?

—নিশ্চয়ই।

—আমি আইনজীবী হিসাবে তোমার এ উইল করতে বাধ্য বটে,

কিন্তু বন্ধু হিসাবে এ উইল না করার জন্যেই তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি।

—তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এ উইল না করে আমার কোন উপায় নেই। জেকিল বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, বিশ্বাস করো আমি নিরুপায়।

—ঠিক আছে। তোমার এ উইলটায় আমি সাক্ষী থাকছি। আর রেজেষ্ট্রিও করে দেব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমার এই নতুন পাওয়া বন্ধুটি তেমন সুবিধার নয়। যে কোন কারণেই হোক তুমি ওর খপ্পরে পড়ে গেছো।

—তা হয়তো হবে। জেকিল অদ্ভুত হেসে বললেন, একদিক দিয়ে তুমি ঠিকই বলেছো অ্যাটার্সন।

—তোমাকে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারি।

ঈশ্বর ছাড়া আমাকে কেউ এখন সাহায্য করতে পারবে না।

বলেই জেকিল হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। অ্যাটার্সন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

॥ ডক্টর ব্রাউন নিহত ॥

দু চার দিন পর লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে হেড লাইনে প্রকাশিত হল ডক্টর ব্রাউনের নৃশংস হত্যার সংবাদ।

বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন…

"বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর ব্রাউনকে গতরাত্রে কে বা কারা তাঁর নিজস্ব বাসভবনে নৃশংসভাবে হত্যা করে রেখে গেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ: ডক্টর ব্রাউন তাঁর ল্যাবরেটরিতে অধিক রাত্র পর্যন্ত গবেষণার কাজে মগ্ন ছিলেন। পাঠকদের স্মরণ আছে নিশ্চয়, এই ডক্টর ব্রাউনই কিছুকাল পূর্বে একটি অদ্ভুত আকৃতির বেড়াল আবিষ্কার করেন এবং তার সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য দিয়ে বিজ্ঞান জগতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। বিশেষ সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, তিনি শীঘ্রই এমন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার

করতে যাচ্ছিলেন যা বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর সৃষ্টি করতে পারত। এই অবস্থায় ডক্টর ব্রাউনের এই আকস্মিক মৃত্যুতে বিজ্ঞান জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। ডক্টর ব্রাউনের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে পুলিশ যথারীতি তদন্ত শুরু করেছে। এখনও তাঁর হত্যার কারণ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। শুধু জানা গেছে, একটা অদ্ভুত দর্শন জন্তুর (মানুষ ?) আক্রমণে ডক্টর ব্রাউন নিহত হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর ব্রাউনের ঘর থেকে টাকাকড়ি কিংবা মূল্যবান কোন বস্তু খোয়া যায়নি। খোয়া গেছে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাগজ-পত্র এবং মূল্যবান ফটোগ্রাফ, ফিল্ম ও কেমিক্যালস। তবে কি এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে কারো কোন উদ্দেশ্য আছে ? আমরা আশা করি, পুলিশ শীঘ্রই এ হত্যা রহস্যের প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করে অপরাধীকে খুঁজে বের করতে পারবে।"

ডক্টর ব্রাউনের এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে লণ্ডনের জনমানসে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হল।

পুলিশের বড় কর্তার নির্দেশে ইন্সপেক্টর এলেন ডক্টর ব্রাউনের বাড়িতে তদন্ত করতে।

বাড়ির অন্যান্য চাকরদের জেরা করবার পর ব্রাউনের খাস বেয়ারা জর্জকে ডাকা হল।

ইন্সপেক্টর বললেন, ডক্টর ব্রাউনকে তুমিই প্রথম মৃত অবস্থায় দেখেছিলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ইন্সপেক্টর, জর্জ বলল।

—ঘটনাটা ভালো করে বলো। কিছু বাদ দিও না।

—ডক্টর ব্রাউন গভীর রাত পর্যন্ত তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ করতেন। দরকার হলে কলিং বেল টিপে আমাকে ডাকতেন। তিনি কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, কোন অবস্থাতেই তাঁকে যেন না ডাকা হয়। আমাকে সব সময়ই কান খাড়া করে বসে থাকতে হত, কখন তাঁর কলিং বেলটা বেজে ওঠে। সেদিনও আমি বসে ছিলাম, তাঁর কলিং বেলের আওয়াজ শোনার অপেক্ষায়। হঠাৎ এক সময়ে

কলিং বেলটা বেজে উঠেই থেমে গেল। আমি ছুটে গেলাম উপরে তাঁর ল্যাবরেটরিতে। দরজা বন্ধ দেখে আবার ফিরে এলাম।

—তুমি দরজায় ধাক্কা দাওনি কেন? ইন্‌সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন।

—মনিব পাছে বিরক্ত হন, এই কারণে ধাক্কা দিই নি। ভেবে-ছিলাম, মনিব বোধ হয় আমাকে ডাকতে চেয়েছিলেন। তারপর কি ভেবে দরজা খোলেন নি। সাধারণত দু তিনবার কলিং বেল বাজিয়ে উনি ডাকতেন।

—তুমি নীচে এসে কি করলে?

—আমি নীচে এসে আমার ঘরে বসতে না বসতে উপর থেকে তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম। শুনেই আমি আবার উপরে ছুটে গেলাম। এবারও দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। আমি এবার দরজায় ধাক্কা মারতে লাগলাম। দরজা খুলল না। ইতিমধ্যে অন্যান্য সকলে এসে হাজির হয়েছিল। কে একজন একটা শাবল এনে দিল। আমি সেই শাবলটা দিয়ে চাড় দিয়ে দরজা খুলে ফেললাম। দেখলাম ডক্টর ব্রাউন মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন। আর জানলা দিয়ে অদ্ভুত চেহারার একটা জন্তু নীচে নেমে যাচ্ছে।

—অদ্ভুত চেহারা মানে?

—দেখতে অনেকটা গেরিলার মতো। মুখখানা সে রকমই। মাথায় মুখে বড় বড় লোম। হাত দুখানা গদার মতো। দাঁতগুলো লম্বা লম্বা—মুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

—বাঃ। তুমি তো অনেক কিছু লক্ষ্য করেছো। তারপর?

—আমি হাতের শাবলটা তার দিকে তাক করে ছুড়ে মারলাম। কিন্তু ওটা ততক্ষণে নেমে চলে গেছে। দৌড়ে জানলার ধারে গিয়ে দেখি শক্ত একটা মোটা দড়ি ঝোলানো। তাই বেয়ে ওটা নেমে গেছে।

—তুমি কি স্থির নিশ্চিত যে ওই জন্তুটাই ডক্টর ব্রাউনের

হত্যাকারী ?

—তাছাড়া আর কে হবে ? যাহোক আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে পুলিশকে টেলিফোন করলাম। পুলিশ চলে এল, মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্যে নিয়ে গেল।

—ঠিক আছে জর্জ। তুমি এসব কথা কাউকে বলবে না, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত লণ্ডনের বাইরে কোথাও যাবে না।

—ঠিক আছে স্যার।

এরপর ইন্‌সপেক্টর আরো কয়েকজনকে জেরা করে নোট নিয়ে চলে গেলেন।

॥ এডওয়ার্ড হাইডের আবির্ভাব ॥

সবেমাত্র সকাল হয়েছে। কিন্তু লণ্ডনের পথ ঘন কুয়াশার আবরণে এমনভাবে ঢাকা যে মনে হচ্ছে এখনও রাত্রি শেষ হয়নি।

মিষ্টার এনফিল্ড ওই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হন হন করে পথ হাঁটছিলেন লণ্ডনের সোহো পল্লীর ভিতর দিয়ে। পথে একটা মানুষ নেই। শুধু একটি মেয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এনফিল্ড অবাক হলেন। এত ভোরে মেয়েটা ছুটছে কেন ?

হঠাৎ চমকে উঠলেন এনফিল্ড। একটা বেঁটেখাটো মানুষ একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। মুখের অনেকখানি লম্বা টুপি দিয়ে ঢাকা।

লোকটি মেয়েটির সামনে এসে তার হাত চেপে ধরল। মেয়েটি মুখ তুলে এক নজর তাকিয়ে ভয়ে চিৎকার করে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ল। লোকটি লুটিয়ে পড়া মেয়েটিকে এক লাথি মারল।

এনফিল্ড এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি ছুটে গিয়ে লোকটার কলার চেপে ধরলেন। লোকটার মাথা থেকে টুপিটা খুলে পড়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে এনফিল্ড সভয়ে পিছু সরে এলেন। এ লোকটা কি মানুষ? না গেরিলা মানুষ? মুখখানি একেবারে গেরিলার



মতো। ঘাড়ে গলায় বড় বড় লোম। লম্বা লম্বা চুল মুখের ওপর দিয়ে নীচে নেমে পড়েছে। টুপিতে মুখখানা ঢাকা ছিল বলে মুখের এ বীভৎসতা ঠিক বোঝা যায় নি।

এনফিল্ডও ভীতু ধরনের মানুষ নন। তাঁর গায়েও প্রচুর শক্তি। নিজেকে তিনি মুহূর্তে সামলে নিলেন। মানুষই হোক কিংবা গেরিলাই হোক, একে শায়েস্তা করতেই হবে। তিনি ছুটে এগিয়ে গিয়ে আবার তার কলার চেপে ধরে মুখে এক ঘুষি মারলেন। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন লোক ছুটে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, আরে, এ তো আমাদের পাড়ার লুসি। এর বাবার খুব অসুখ। বোধহয় ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল।

এর মধ্যে বলবান একটা যুবক এসে সেই বেঁটে খাটো লোকটাকে আরও কয়েকটা ঘুষি মেরে কাবু করে ফেলল।

ঘুষি খেয়ে লোকটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, আমাকে দয়া করে মারবেন না। আমি কোন অপরাধ করিনি।

—অপরাধ করনি। এনফিল্ড খেঁকিয়ে উঠলেন, তুমি শুধু শুধু এই মেয়েটিকে মারতে গেলে কেন? আর একটু হলে তো মরেই যাচ্ছিল।

লোকটি কিছুক্ষণ বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তারপর এনফিল্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, বিশ্বাস করুন, এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। আমি হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এরকম মাঝে মাঝে হয় আমার।

—আপনার নাম কি? এনফিল্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার নাম এডওয়ার্ড হাইড। আমি মেয়েটিকে মেরে যে ক্ষতি করেছি, তার কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে চাই।

—কি রকম ক্ষতিপূরণ।

—আমি হাজার পাউণ্ড দিতে চাই ওর বাবাকে। আপনারা কেউ আসুন আমার সঙ্গে।

এনফিল্ড মেয়েটির পাড়ার লোক ও আরও দুই তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে একটা গলির মধ্যে হাইডের বাড়িতে গেলেন। হাইড তার হাতে হাজার পাউণ্ডের নোট দিল। এনফিল্ড সেই টাকাটা আবার দিয়ে এল মেয়েটির বাবার হাতে।

মিষ্টার অ্যাটার্সন হলেন এনফিল্ডের বন্ধু। এনফিল্ড পরদিন সমস্ত ঘটনাটা অ্যাটার্সনকে খুলে বললেন। শুনতে শুনতে অ্যাটার্সনের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ঠিক মনে আছে, লোকটির নাম এডওয়ার্ড হাইড ?

—মনে থাকবে না কেন ? এনফিল্ড অবাক হয়ে বললেন, আমার স্মৃতি শক্তি কি এতই দুর্বল যে আমি কাল শোনা নাম আজই ভুলে যাবো ! কেন তুমি লোকটিকে চেনো নাকি ?

—না, ঠিক চিনি না। তবে চিনতে চাই। তুমি পারবে আমাকে নিয়ে যেতে সেই লোকটির বাড়িতে ?

—পারবো না কেন ? চল এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি।

এনফিল্ড অ্যাটার্সনকে নিয়ে এ গলি সে গলি পার হয়ে অবশেষে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—এই সেই বাড়িটা। এনফিল্ড পুরোনো আগেকার আমলের একটি বাড়ির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন।

অতি সাধারণ একটি দোতালা বাড়ি। দরজা জানলা সব পুরোনো। দেখে মনে হয়, বাড়িটার পিছনে যত্ন নেবার কেউ নেই। জানলা দরজা সব বন্ধ। এখানে যে লোকজন কেউ থাকে, তা মনে হয় না।

—এডওয়ার্ড হাইড এই বাড়িতেই সেদিন ঢুকে গিয়েছিল, আর ভিতর থেকে নিয়ে এসেছিল হাজার পাউণ্ডের নোট।

—এই বাড়িতে মানুষ থাকে কি করে ? অ্যাটার্সন বললেন। অবশ্য নোট জাল করবার পক্ষে এটা একটা আদর্শ জায়গা।

—না, নোটগুলো সব খাঁটিই ছিল। এনফিল্ড হেসে বললেন।

—স্বীকার করতেই হবে, 'হাইড' নামের লোকের উপযুক্ত বাসস্থান এটা। কোন অপরাধ করে লুকিয়ে থাকবার আদর্শ জায়গা। তুমি হাইডকে কোন কথাটথা জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

—কোন কথা ?

—এই যেমন, এখানে কতদিন আছে—কাজকর্ম কি করে ইত্যাদি !

—আমি শুধু শুধু ওসব জিজ্ঞাসা করতে যাবো কেন ? কোন মানুষের ব্যক্তিগত খোঁজ খবরে আমার কোন উৎসাহ নেই ।

—তোমার না থাকলেও আমার আছে, অ্যাটার্সন বললেন, অন্তত এই হাইডের ব্যাপারে । লোকটার সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানতে হবে ।

—হঠাৎ তোমার এই হাইড সম্বন্ধে এত কিছু জানবার দরকার হল কেন ?

—হয়েছে দরকার । আমার ধারণা, এই হাইড লোকটি অত্যন্ত ভয়ংকর একটি ক্রিমিন্যাল ।

—এ বিষয়ে অবশ্য আমিও তোমার সঙ্গে একমত । লোকটাকে প্রথম দেখেই আমার সে কথা মনে হয়েছিল । দু একটা লোক এমনি থাকে যাদের দেখলেই তার আসল পরিচয় বলে দেওয়া যায় । এ লোকটাও সেই দলের ।

—ধন্যবাদ । জীবনে এই একটা বিষয়ে আমরা দুজনে একমত হলাম । আশা করি, ডক্টর ব্রাউনের হত্যকাণ্ড ও তার হত্যাকারীর বিবরণ যা কাগজে বেরিয়েছিল, তা তোমার মনে আছে ?

—খুব মনে আছে । গেরিলার মতো মুখ—লোমশ শরীর—বেঁটে খাটো চেহারা—উত্তেজনায় এনফিল্ডের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে, তবে কি তুমি বলতে চাও হাইডই ব্রাউনের হত্যাকারী !

—আমি কিছুই বলতে চাই না । আমি শুধু দুটো ব্যাপারের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজতে চাইছি । আমার মনে হয়, দুটো ব্যাপারের মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে ।

—তোমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে তো ভয়ানক কাণ্ড । পুলিশ ব্রাউনের হত্যাকারীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, আর সে এখানে ‘হাইড’ নামে নিজেকে ‘হাইড’ করে রেখেছে ; আমাদের তো এখুনি

পুলিশের কাছে যোগাযোগ করা দরকার।

—পুলিশের সাথে নিজে থেকে যোগাযোগ করতে গেলে ঝামেলা বাড়বে ছাড়া কমবে না। আগে আমরা নিজেরা এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখি। দরকার হলে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

—ঠিকই বলেছো। এনফিল্ড বললেন, আগে এই এডওয়ার্ড হাইডের গতিবিধিটা ভালো করে লক্ষ্য করি। আশে পাশের লোকের কাছে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে দেখি। ডক্টর ব্রাউনের হত্যাকারী, গেরিলা মানুষ, এডওয়ার্ড হাইড সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—যেভাবে হোক রহস্যভেদ করতেই হবে। অ্যাটার্সন বললেন, আমাদের এক বন্ধুকে বাঁচাতে হলে এই এডওয়ার্ড হাইডকে অন্ধকার থেকে আলোয় টেনে আনতেই হবে।

—পুলিশও শুনছি ডক্টর ব্রাউনের হত্যাকারীকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। এনফিল্ড বললেন।

—সে রকমই তো শুনেছি। চল এখন বাড়ির দিকে যাওয়া যাক।

ওরা দুজনে যে-যার বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

॥ ডক্টর জেকিলের বাড়িতে ॥

পুলিশ বিভাগ থেকে ডক্টর ব্রাউনের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করবার জন্য জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে বেতারে ডক্টর ব্রাউনের হত্যাকারীর একটা বর্ণনা দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে—

"প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর ব্রাউনের সম্ভাব্য হত্যাকারীর সন্ধান কেউ জানলে তিনি যেন অবিলম্বে পুলিশের সদর দপ্তরে যোগাযোগ করেন। সম্ভাব্য হত্যাকারীর আকৃতি অনেকটা গেরিলার মতো।"

পুলিশ বিভাগের দক্ষ শিল্পী এই বিজ্ঞপ্তির নীচে একটা ছবিও এঁকে দিয়েছে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি লণ্ডনের সর্বত্র প্রচারিত হবার পর লণ্ডন পুলিশের সদর দপ্তরে কয়েকজন লোক এসে হাজির হল। তারা এই বিজ্ঞপ্তির বর্ণনা অনুযায়ী গেরিলার মতো লোককে নাকি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছে। এদের সবার বর্ণনাই প্রায় একরকম। গভীর রাতে তারা লণ্ডনের পথে এই ভয়ংকরদর্শন লোকটিকে দেখেছে। গভীর রাতে পথে লোক থাকে না। সেই সময়ই একে দেখা গেছে।

এদের মধ্যে এক ভদ্রলোক বললেন, আমি ওই লোকটিকে ডক্টর জেকিলের বাড়ির পিছনের বাগানে ঢুকতে দেখেছি।

পুলিশ ইনস্‌পেক্টর এই ভদ্রলোককে আলাদা করে ডেকে নিয়ে জেরা করলেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমি বিশেষ একটা দরকারী কাজে আমার বাড়ি ফিরছিলাম। রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। হঠাৎ দেখি একটা বেঁটেখাটো মানুষ প্রায় ছুটতে ছুটতে উলটো দিক থেকে আসছে। লোকটির মুখের অনেকটাই টুপি দিয়ে ঢাকা। কেমন গেরিলার মতো থপ থপ করে ছুটছিল লোকটা। ছুটতে ছুটতে ডক্টর জেকিলের বাড়ির পিছন দিককার বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল।

—ডক্টর জেকিলের বাড়ি আপনি চেনেন? ইনসপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন।

—বাঃ। চিনবো না কেন? অত বড় বৈজ্ঞানিক। আর তাছাড়া আমি কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছি কোন কাজের সূত্রে।

—ঠিক আছে। বলুন।

—লোকটা ডক্টর জেকিলের বাগানের মধ্যে ঢুকল দেখে আমি দূর থেকে লক্ষ্য করতে লাগলাম...ব্যাপারটা কি। দেখলাম লোকটা বাগানের গাছপালার মধ্যে দিয়ে একটা দরজার দিকে এগোচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। আমার পায়ের শব্দে লোকটা ঘুরে তাকাল। আর সেই সময় তার মুখের সামনে

থেকে টুপিটা সরে গেল। তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম—একেবারে হুবহু গেরিলার মতো...কি বীভৎস...ভয়ংকর। ওই মুখ দেখে আমি এত ভয় পেয়ে গেলাম যে সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুট লাগালাম।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ইনসপেক্টর বললেন, যদি প্রয়োজন হয় লোকটাকে সনাক্ত করতে পারবেন তো?

—নিশ্চয়। ও মুখ একবার দেখলে সারাজীবন দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকে।

ভদ্রলোক চলে গেলে এবার ঢুকলেন মিষ্টার এনফিল্ড। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনাদের বিজ্ঞপ্তিটি দেখেই আমি আসছি। আমিও ওই ধরনের একটা মানুষকে দেখেছি।

পুলিশ ইনসপেক্টর বললেন, আপনি কি করে তাকে চিনলেন?

—শুধু চেনা নয়, আমি তার সাথে কথাও বলেছি। তার বাড়িও চিনি।

—বলেন কি। উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ইনসপেক্টর, দয়া করে সবটা খুলে বলুন মিষ্টার এনফিল্ড।

এনফিল্ড তখন সব ঘটনা খুলে বললেন। সেদিন রাত্রে মেয়েটিকে মারধোরের ঘটনা থেকে টাকা দেওয়া পর্যন্ত সব কিছুই তিনি বললেন।

সব কথা শুনে ইনসপেক্টর বললেন, তাহলে আর দেরী নয়। এক্ষুণি চলুন। সেই বাড়ি আমরা রেড করবো।

ইনসপেক্টর সশস্ত্র কয়েকজন পুলিশ নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলেন। মিষ্টার এনফিল্ডও ওদের সঙ্গী হলেন।

এ গলি সে গলি ঘুরে মিষ্টার এনফিল্ডের নির্দেশে গাড়ি এসে থামল সেই ভাঙাচোরা বাড়িটার সামনে। পুলিশের গাড়ি দেখে একদল লোক কৌতূহলী হয়ে জড় হল।

এনফিল্ড লাফ দিয়ে নামলেন গাড়ি থেকে। পিছনে ইনসপেক্টর। বাড়িটার দরজার সামনে এসে দেখলেন, দরজায় বিরাট একটা

তালা ঝুলছে।

—ভাগ্য খারাপ। এনফিল্ড ইনসপেক্টরের দিকে তাকালেন, পাখি পালিয়েছে।

—পালাবে কোথায়। ঘরে তাকে ফিরতেই হবে। চলুন, আমরা বরং ডক্টর জেকিলের বাড়িতে একবার যাই।

—ডক্টর জেকিলের বাড়িতে কি দরকার?

—দরকার আছে একটু। চলুন যাওয়া যাক।

এবার ওরা আবার গাড়িতে চড়ে পৌঁছে গেলেন ডক্টর জেকিলের বাড়িতে।

কলিং বেল টিপতে দরজা খুলে দিল বাটলার।

ইনসপেক্টর বললেন, আমি পুলিশ দপ্তর থেকে আসছি। ডক্টর জেকিলের সাথে দেখা করতে চাই।

—উনি কারো সাথে দেখা করেন না। বাটলার ভাবলেশহীন মুখে বলল।

—তুমি খবর দাও। বলো পুলিশ দপ্তর থেকে পুলিশ ইনসপেক্টর বার্টলে এসেছেন একটি তদন্ত করতে।

—আমাদের উপর কড়া নির্দেশ আছে ওঁকে বিরক্ত না করার জন্যে।

—তুমি যাও তো। ইনসপেক্টর ধমক দিলেন, যা বলছি তাই কর।

বাটলার চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, না, উনি দেখা করতে রাজী হলেন না।

ইনসপেক্টর বললেন, তাহলে আমাকেই যেতে হল দেখছি।

তিনি উপরে চলে গিয়ে কলিং বেল টিপলেন।

ইনসপেক্টর চেঁচিয়ে বললেন, আমি পুলিশ ইনসপেক্টর বার্টলে। বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

—আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি দেখা করতে পারব না।

—দেখা করা বিশেষ দরকার। আপনি দয়া করে দরজা খুলুন।

এর পর অনেকক্ষণ কেটে গেল। ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ



শোনা গেল না।

প্রায় দশ মিনিট পর দরজা খুলে ডক্টর জেকিল বেরিয়ে এলেন।

মাথার চুল এলোমেলো। কেমন যেন বিষণ্ণ উদাস চেহারা।

ডক্টর জেকিল বসতেও বললেন না ইন্‌সপেক্টরকে। শুকনো গলায় বললেন, কি দরকার বলুন।

ইন্‌সপেক্টর বললেন, ডক্টর ব্রাউনকে হত্যা করা হয়েছে আপনি জানেন?

—হতে পারে। আমি জানি না। খবরের কাগজটাগজ আমি পড়ি না!

—আপনি কি তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

—ডক্টর ব্রাউনের হত্যাকারী বলে বর্ণিত একজন লোককে রাত্রি বেলায় আপনার বাড়ির পিছন দিকে বাগানে ঢুকতে দেখা গেছে।

—আমার বাগানে কে ঢুকছে না ঢুকছে, তা দেখার সময় আমার নেই।

—মিষ্টার হাইড নামে কোন লোককে আপনি চেনেন?

—হাইড ফাইড কাউকে আমি চিনি না। ঠিক আছে। আপনি এবার যেতে পারেন।

ডক্টর জেকিল ইন্‌সপেক্টরের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিলেন।

॥ লণ্ডনের পথে নরহত্যা ॥

লণ্ডনের পথে রাত দশটায় প্রচণ্ড কুয়াশা।

কুয়াশার আবরণে পথের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। স্যার ডানভার্স কেরু নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে পথ চলেছেন। কুয়াশায় ভাল পথ দেখতে পাচ্ছেন না বলে তাঁর চলার গতি খুব ধীর।

পথে লোকজনও ছিল না; স্যার কেরু একবার পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আবার মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

মনে মনে ভাবছিলেন, পথে কোন লোক দেখতে পেলে তাকে

একটু সাহায্য করতে বলবেন।

ঠিক সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটা মানুষকে আসতে দেখে তিনি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যাক্, ঈশ্বর তার কথা শুনতে পেয়েছেন।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মানুষটা এগিয়ে আসছে। স্যার কেরু ওর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। লোকটার মুখের সামনের দিকটা টুপিতে ঢাকা।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভালো দেখা যাচ্ছে না। মানুষটা খুব কাছে আসতে স্যার কেরু ডাকলেন, মিষ্টার—শুনছেন—

সেই ডাক শুনে বেঁটেখাটো মানুষটা ভীষণভাবে চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকাল। মুখের টুপিটা ঈষৎ সরে গেল।

আর সে মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলেন কেরু। অবিকল একটা গেরিলার মুখ। কদিন ধরে খবরের কাগজে এই মুখের বর্ণনাই তো পড়ছেন। এই কি সেই গেরিলা মানুষ? স্যার কেরুর শরীরের রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই গেরিলা মুখ মানুষটা দাঁত কিড়মিড় করে কি বলল। তারপর স্যার কেরুর হাতের লাঠিটা টেনে নিয়ে তাঁকে এলোপাথারি মারতে লাগল।

স্যার কেরু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। গেরিলা মানুষটা ক্ষেপে গিয়ে লোহার মতো দুটো লোমশ হাত দিয়ে কেরুর গলা টিপে ধরল। কেরুর জিভ বেরিয়ে এল। চোখ জোড়া যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ হল। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটির উপর।

গেরিলা মুখ মানুষটা প্রায় ছুটে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্যার কেরুর চিৎকার শুনে ততক্ষণ কয়েকজন লোক জড় হয়েছে।

তারাই পুলিশকে খবর দিল। খবর পেয়েই ইন্‌সপেক্টর বার্টলে ছুটে এলেন। মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনি আশেপাশের

মানুষকে জেরা করতে লাগলেন।

কাছের একটা বাড়ির একজন মহিলার কাছ থেকে জানা গেল, একটা বেঁটেখাটো মানুষ নাকি একটু আগে দৌড়ে চলে গেছে। মাথার আকৃতিটা ঠিক জন্তুর মতো।

ইন্‌সপেক্টরের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড কি তাহলে সেই হাইডের?

পরদিন ইন্‌সপেক্টর বেলা দশটা নাগাদ দলবল নিয়ে চলে গেলেন হাইডের বাড়িতে।

আজও দরজায় তালা ঝুলছে। ইন্‌সপেক্টর হাল ছাড়বার পাত্র নন। তিনি পাশের ফ্ল্যাটের এক বৃদ্ধা মহিলাকে ধরলেন। তাকে বললেন, আমরা পুলিশ দপ্তর থেকে আসছি। মিষ্টার হাইডের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—হাইড তো বাড়িতে নেই। ওই তো দরজায় তালা ঝুলছে।

—কাল রাতে কখন বাড়ি এসেছিল?

—কিছুই জানি না। তবে গভীর রাতে ধুপধাপ আওয়াজ শুনে বুঝতে পারছিলাম, গভীর রাতে ফিরেছে।

—কখন বেরিয়ে গেল?

—তাও জানি না। আসল ব্যাপার হল, লোকটা যে কখন আসে আর কখন যায়, তা আমরা ভালো করে বুঝতে পারি না।

—মিষ্টার হাইড কি কাজ করেন?

—সে সব কিছুই বলতে পারবো না। লোকটা কারো সাথে কথা বলে না। কেউ তার সাথে কথা বলুক তাও পছন্দ করে না।

—এ বাড়িতে কতদিন ধরে আছে?

—বেশী দিন নয়। সামান্য কিছু দিন হল এ বাড়িটা কিনে নিয়ে এখানে বাস করতে শুরু করেছে।

—লোকজন কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে?

—কাউকে দেখিনি।

—ধন্যবাদ।

ইন্‌সপেক্টর দলবল নিয়ে ফিরে গেলেন দপ্তরে।

॥ এ কোন হাইড ॥

এদিকে মিষ্টার অ্যাটার্সনও চুপ করে বসে নেই। তিনিও হাইডের খোঁজ খবর করবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর চেনাজানা মানুষের সংখ্যা কম নয়। সবার কাছেই তিনি এডওয়ার্ড হাইড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

—ভাই, এডওয়ার্ড হাইড নামে কোনো মানুষকে চেনো?

—কোন এডওয়ার্ড হাইড?

—ওই বেঁটেখাটো একটা মানুষ—মুখখানা দেখতে অনেকটা গেরিলার মতো?

—নাঃ। ওরকম কোন মানুষকে চিনি না।

অ্যাটার্সন হাল ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এবার হাইডের বাড়িটার কাছাকাছি ঘোরাফেরা শুরু করলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সুযোগ পান, হাইডের সেই ভাঙাচোরা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ান।

কিন্তু কি আশ্চর্য! হাইডকে কোনদিন ওই বাড়িতে ঢুকতেও দেখলেন না, বেরোতেও দেখলেন না। লোকটা কি এখানে নেই? গা ঢাকা দিয়েছে?

অ্যাটার্সন ধৈর্য হারালেন না। তিনি আগেকার মতোই সমানে পাহারা দিতে লাগলেন সেই বাড়িটা। এবার তিনি পাহারা দেবার কায়দাটা একটু বদলালেন। তাঁর ধারণা হল, হাইড এখানে আসে গভীর রাতে। তাই তিনি রাতের দিকে আসা শুরু করলেন।

রাত দশটা এগারোটা বারোটা নাগাদ তিনি ওই বাড়িটার আশে পাশে ঘোরাফেরা শুরু করলেন।

রাত প্রায় বারোটা। লণ্ডনের আকাশ আজ কুয়াশাহীন—পরিষ্কার।

দোকানপাট আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পথে একটাও লোক ছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অ্যাটার্সন যখন ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে গেছেন, তখনই দেখতে পেলেন, উলটো দিক থেকে একটা বেঁটে-খাটো মানুষ থপথপ করে এগিয়ে আসছে। মুখের অনেকখানি ঢাকা পড়েছে বেঢপ একটা টুপিতে।

অ্যাটার্সনের শরীরে রক্ত চলাচল যেন দ্রুত হয়ে এল। এ নিশ্চয় সেই এডওয়ার্ড হাইড যার প্রতীক্ষায় কেটে যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত।

অ্যাটার্সন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেঁটেখাটো লোকটা আরো কাছে এগিয়ে এল। কুয়াশা ছিল না। এবার তিনি মানুষটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন। পরনে ঢিলেঢালা একটা কোট প্যান্ট। মনে হয়, অন্য কারো প্যান্ট কোট।

অ্যাটার্সন একটু দূরে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

লোকটা সেই ভাঙাচোরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকে একবার তাকাল। তারপর কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে তালার মধ্যে ঢোকাল।

আর ঠিক সেই সময় অ্যাটার্সন পা টিপে টিপে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মৃদুকণ্ঠে বললেন, কেমন আছেন মিষ্টার হাইড?

তালার চাবি তালার মধ্যেই রয়ে গেল। লোকটা চমকে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

টুপিটা মুখের ওপর আরো নামিয়ে দিয়ে কেমন খনখনে গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে?

—আমি ডক্টর জেকিলের বন্ধু মিষ্টার অ্যাটার্সন। কয়েকদিন ধরেই আমি আপনাকে খুঁজছি।

—কেন? আমাকে খুঁজছেন কেন? তীব্রস্বরে হাইড বলল, আমার সাথে আপনার কি দরকার?

—আছে বৈকি দরকার, অ্যাটার্সন বললেন, চলুন ঘরের মধ্যে গিয়ে কথাবার্তা বলা যাক।

—কথাবার্তা বলার ইচ্ছে আমার নেই। হাইড ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনাকে আমি চিনি না। আমার সাথে আপনার কোন দরকারই থাকতে পারে না।

—ডক্টর জেকিল আমাকে আপনার কথা বলেছেন। সে-ও তো আপনার বন্ধু।

—নাঃ। ডক্টর জেকিল আমার বন্ধু নন। হাইড তীব্রস্বরে বলল, ওসব আজেবাজে কথা আমাকে বলবেন না।

মিষ্টার অ্যাটার্সন হতভম্ব হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা কি। জেকিল এই কে এক এডওয়ার্ড হাইডের নামে তার সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছে। এই লোকটা কি সেই এডওয়ার্ড হাইড নয়? সে কি অন্য আর একজন হাইড?

অ্যাটার্সন বেশ ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলেন। তিনি এবার অনুনয় করে বললেন, আমাকে দয়া করে একটু সময় দিন। আপনার সাথে সত্যি আমার খুব দরকার।

হাইড কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে নিল। তারপর বলল, ঠিক আছে। আজ আমার পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। আপনি অন্য একদিন আমার সাথে দেখা করবেন। তবে এখানে নয়, অন্য একটা ঠিকানায়।

—কোন ঠিকানায়?

—সোহো পল্লীর একটা বাড়িতে।

হাইড অ্যাটার্সনকে একটা নম্বর বলে দিল।

—ঠিক আছে, আমি ওই ঠিকানায় আপনার সাথে দেখা করবো।

হাইড এতক্ষণ কথা বলছিল অনেকটা মুখ নীচু করে—মুখের অনেকটা টুপি দিয়ে ঢাকা থাকায় মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না।

অ্যাটার্সন বললেন, মিষ্টার হাইড, একটা অনুরোধ করবো,

রাখবেন কি ?

—কি অনুরোধ ?

—দয়া করে আপনার মুখ থেকে টুপিটা একটু সরাবেন কি ? ভালো করে আপনার মুখটা দেখতে চাই।

—আমার মুখটা দেখতে চান ? এই দেখুন। হাইড এক টানে মুখ থেকে টুপিটা সরিয়ে দিল। গেরিলার মতো বীভৎস মুখটার মধ্যে জ্বলন্ত দুটো চোখ অ্যাটার্সনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অ্যাটার্সন সে বন্য দানবিক দৃষ্টি দেখে শিউরে উঠলেন।

হঠাৎ হাইড পাগলের মতো হো হো করে হেসে উঠল। তারপর দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

॥ ডাক্তার লেজিয়নের বাড়িতে ॥

পরদিন ভোরবেলা অ্যাটার্সন গেলেন ডক্টর জেকিলের বাড়ি।

জেকিলের খাসভৃত্য পুলকে বললেন, তুমি ডক্টর জেকিলকে খবর দাও। বলো মিষ্টার অ্যাটার্সন এসেছেন।

পুল বলল, আপনাকে আমি ভালো মতোই চিনি মিষ্টার অ্যাটার্সন। কিন্তু আমি দুঃখিত, কোন খবর দিতে পারব না।

—কেন ? খবর দিতে পারবে না কেন ?

—খবর দিতে পারব না এইজন্যে যে খবর দিয়ে কোন লাভ নেই। প্রথমত কোন অবস্থাতেই ওকে যেন না ডাকি, এ রকম কড়া নির্দেশ আছে ; দ্বিতীয়ত নির্দেশ না মেনে দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি করলেও উনি দরজা খুলবেন না।

—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো। অ্যাটার্সন বললেন।

—আমাদের কাছেও তো অদ্ভুত মনে হচ্ছে। পুল বলল, আগে তো এমন ছিলেন না। বেশ কিছুকাল যাবৎ উনি সমস্ত রকম দেখা

সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। এমন কি টেলিফোনও ধরেন না।

—তাহলে আর কি করা যাবে। ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে চললেন অ্যাটার্সন।

ভেবেছিলেন জেকিলের সাথে দেখা করে হাইডের ব্যাপারটা আজ যেভাবেই হোক জেনে নেবেন। আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দেবেন —উইলটাও রেজেস্ট্রি হয়ে গেছে। কিন্তু দেখাই হল না জেকিলের সাথে।

অ্যাটার্সন এবার উপস্থিত হলেন এনফিল্ডের বাড়ি।

এনফিল্ড তাঁকে দেখে হাসিমুখে বললেন, আরে এসো এসো। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।

—কেন? ব্যাপার কি? আমার কথা ভাবছিলে কেন?

—লণ্ডনের পুলিশ তো হাইডকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। দু দুটো খুনের চার্জ তার ঘাড়ে।

—স্যার কেরুর খুনের জন্যেও কি হাইডকে দায়ী করা হচ্ছে?

—নিশ্চয়। আততায়ীর চেহারার যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তার সাথে হাইডের চেহারার দারুণ মিল। দু দুটো খুন করে লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

—আমি যদি বলি হাওয়ায় মেলায়নি, দিব্যি লণ্ডনের বুকের উপর বহাল তবিয়তে রয়েছে।

—অসম্ভব। পুলিশ শুনেছি চারদিকে জাল পেতে রেখেছে ওই বেঁটে খাটো গেরিলাটাকে বন্দী করবার জন্যে। হাইড যদি লণ্ডন শহরে থাকতো, তাহলে পুলিশ এতদিনে ওকে গ্রেপ্তার করে ফেলতো।

—আমি বলছি হাইড লণ্ডন শহরেই আছে। আমার সাথে তার দেখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তার সাথে আমার কথাও হয়েছে।

—বলকি। কি ভাবে দেখতে পেলে? উত্তেজনায় প্রায়

লাফিয়ে উঠলেন এনফিল্ড, কোথায় দেখলে ? কি অবস্থায় দেখলে ?

অ্যাটার্সন তখন হাইডের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা বললেন।

এনফিল্ড বললেন, সোহো পল্লীর ওই বাড়ির ঠিকানাটা পুলিশকে দিয়ে দেওয়া ভালো।

—আমি পুলিশকে দিতে যাবো কেন ? দরকার হলে পুলিশ নিজে বের করে নিক। ওই দুটো হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারী হাইড সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই।

—তবে তুমি হাইডকে এত খুঁজছো কেন ?

—আমি খুঁজছি জেকিলের সম্পত্তিটা বাঁচানোর জন্য—কিংবা বলতে পারো জেকিলকেই বাঁচানোর জন্যে।

—ব্যাপারটা কি বলো তো। জেকিলের সঙ্গে আবার হাইডের সম্পর্ক কি ?

—আছে সম্পর্ক। হাইডই জেকিলের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জেকিলের হঠাৎ মৃত্যু হলে কিংবা নিরুদ্দিষ্ট হলে সে তার সমস্ত সম্পত্তি লাভ করবে।

—বল কি। এত লোক থাকতে এই শয়তানটা জেকিলের সম্পত্তি পাবে কেন ?

—আমিও তো সেই রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছি।

এই বলে অ্যাটার্সন ডক্টর জেকিলের উইলের ব্যাপারটা খুলে বললেন।

এনফিল্ড বললেন, উইলের কথাটা এতদিন বলনি কেন ?

—ছাখ এনফিল্ড। আমি পেশায় অ্যাটর্নী। উইল ব্যাপারটি খুব গোপনীয়। কেউ কোন উইল করালে সেটা গোপনে রাখাই আমার কাজ। এই কারণেই বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে বলিনি। এখন আর না বলে পারলাম না। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডক্টর জেকিলের কোন ভয়ানক বিপর্যয় হতে চলেছে। উইলটা তারই ইঙ্গিতমাত্র।

—তাহলে চল জেকিলের কাছে আমরা দুজন যাই।

—কোন লাভ হবে না। আমি গিয়েছিলাম, শুনলাম সে কারো সাথে দেখাই করছে না।

—সেটা আমিও জানি। জেকিল সারা দিন রাত দরজা জানলা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। বাইরের পৃথিবীর সাথে তার কোন যোগ নেই। সে এমন কি গবেষণা করছে যার জন্যে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবার দরকার হয়।

—ওর গবেষণার ব্যাপার-ট্যাপার আমার জানা নেই, অ্যাটার্সন বললেন, তবে এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে ভাল হত।

—এক কাজ করবে? এনফিল্ড বললেন, ডাক্তার লেজিয়নের কাছে গেলে হয় না? তিনি ডক্টর জেকিলের খুব বন্ধু—নিজেও তো মস্ত বড় ডাক্তার। তিনি নিশ্চয় জেকিলের গবেষণার ব্যাপারটি বলতে পারবেন।

—ঠিক বলেছো। ডাক্তার লেজিয়নের বাড়িতেও যাওয়া যাক।

ডাক্তার লেজিয়ন নামকরা ডাক্তার। শুধু ডাক্তার নন, গবেষক বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম।

অ্যাটার্সন এনফিল্ডকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাভিনভিস স্কোয়ারে ডাক্তার লেজিয়নের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। একথা সেকথার পর তিনি জেকিলের গবেষণার কথা তুললেন।

ডাক্তার লেজিয়ন বললেন, জেকিলকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি, একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি, বিজ্ঞান বিষয়ে কাজকর্মও কিছু দিন এক সঙ্গে করেছি। বিজ্ঞানে ওর খুব মেধা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বরাবর দেখেছি, সে মেধাকে উল্টো পথে চালানোর চেষ্টা করে।

—তার মানে? অ্যাটার্সন বললেন, ব্যাপারটা খুলে বলো তো।

—ছেলেবেলা থেকে দেখেছি জেকিল বিজ্ঞান নিয়ে উদ্ভট উদ্ভট পরিকল্পনা করতে ভালোবাসে। জীবদেহের উপর বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব সম্পর্কেও ও নানা মৌলিক চিন্তা করেছে। মেডিকেল সায়েন্সেও ওর প্রচণ্ড দখল।

এনফিল্ড বললেন, জীবদেহের উপর রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবের ব্যাপারটা কি?

—ওটা একটা বাজে ব্যাপার, লেজিয়ন বললেন, যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন খেলে যেমন স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যায়, তেমনি খুব শক্তিশালী ড্রাগ দিয়ে মানুষের শরীরের স্ফীতি ঘটানো যায়, এ রকম একটা ব্যাপার আর কি। একমাত্র জেকিল ছাড়া অন্য কোন বিজ্ঞানী এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি।

—তাহলে তুমি বলতে চাও অন্য সব বিজ্ঞানীরা যে সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান না, জেকিল সেই সব বিষয় নিয়েই মাথা ঘামায়? অ্যাটার্সন বললেন।

—অনেকটা তাই। সোজা কথায় বিরাট প্রতিভার একটা অপচয় আর কি।

—আচ্ছা, তোমার সাথে তো জেকিলের যোগাযোগ যথেষ্ট ছিল, এখন দেখা সাক্ষাৎ হয়?

—না, এখন আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আমি দু তিনবার দেখা করেছি, কিন্তু দেখলাম, কেমন পাগলাটে হয়ে গেছে। ভালো করে কথা বলতে চায় না।

—তুমি তো ওর প্রায় সব বন্ধুকেই চেনো, অ্যাটার্সন বললেন, এডওয়ার্ড হাইড নামে কোন বন্ধুকে চেনো?

—না, ওই নামে কোন বন্ধু আছে বলে তো শুনিনি। কেন? কি ব্যাপার?

—আছে একটা ব্যাপার। পরে বলবো। শোন, এর মধ্যে জেকিলের সঙ্গে যদি দেখা সাক্ষাৎ হয়, তবে আমাকে অবশ্যই খবর দিও।

—দেব। কিন্তু ব্যাপারটা কি বললে না তো?

—ব্যাপারটা আমিও কিছু জানিনা। অ্যাটার্সন ম্লান হেসে বললেন, আমরা সবাই অন্ধকারের অতলে। ঠিক আছে ভাই, এখন যাচ্ছি।

লেজিয়নের কাছে বিদায় নিয়ে ওঁরা দুজন চলে গেলেন।

॥ হোটেলে নারীহত্যা ॥

লণ্ডন শহরের অভিজাত পাড়ায় একটি হোটেল। অনেকক্ষণ সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। বোর্ডাররা যে যার ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করছে।

রিসেপসন কাউণ্টারে ম্যানেজার হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। দেখতে বেশ লম্বা, টুপিটা নিচের দিকে নামানো, মুখের উপর একটি রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছেন।

—আমার একটি ঘর দরকার—একটি ঘর।

—একটু বসুন। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ম্যানেজার বললেন।

—না। আমার বসবার সময় নেই, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি। দয়া করে এই মুহূর্তে ব্যবস্থা করে দিন।

ম্যানেজার দেখলেন ভদ্রলোক থরথর করে কাঁপছেন। সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

তিনি একটি চাকরকে ডেকে ভদ্রলোককে একটা ঘরে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

ভদ্রলোক চলে যেতে উদ্যত হলে ম্যানেজার বললেন, পরে একটু সুস্থ হলে আপনি এসে রেজিষ্ট্রারে সই করে দিয়ে যাবেন।

ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে চাকরের সঙ্গে চলে গেলেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চাকরটি একটি ঘর খুলল।

ভদ্রলোক প্রায় তাকে ঠেলেই ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

এদিকে চাকরটাও যে পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল নেই।

মুখ থেকে হাত সরাতেই রুমালটা সরে গেল। মুখের অনেকটা দেখা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে চাকরটা ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

এতক্ষণে ভদ্রলোকের চোখ পড়ল চাকরটার দিকে। তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন তার দিকে, কি হয়েছে। চাকরটা তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বলতে পারল না।

সামনেই ড্রেসিং টেবিলে লম্বা একটা আয়না ফিট করা। ভদ্রলোকের চোখ পড়ল সেই আয়নার দিকে। নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেই শিউরে উঠলেন। এ কি মানুষের মুখ? মুখটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। দাঁতগুলো মুখের বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ভ্রূর চুলগুলো লম্বা লম্বা হয়ে ঝুলছে। এদিকে সারা শরীরের মধ্যে জ্বালা।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ব্রিফ কেস খুলে একতাড়া নোট বের করে চাকরটার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, শোন, একটা দুর্ঘটনায় আমার মুখটা এরকম হয়ে গেছে। কাউকে বলো না। এই নাও নোটগুলো রাখ।

এই বলে চাকরটাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দরজা দিয়ে দিলেন।

চাকরটা নোটগুলো হাতে নিয়ে ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে। ম্যানেজার একটা বয়কে পাঠালেন সেই ঘরে।

বয়টা এসে দরজা ধাক্কাধাক্কি করল। ভদ্রলোক দরজা খুললেন না। ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, আমি খুব অসুস্থ। সকালে দেখা করবো। বয় গিয়ে ম্যানেজারকে বলল সে কথা।

ম্যানেজার ভাবলেন, ঠিক আছে। সকালে তো দেখা হচ্ছে।

রাত ক্রমশ গভীর হতে থাকে। চারধারে কোন সাড়াশব্দ নেই। বোর্ডাররা যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভদ্রলোক তাঁর দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারলেন। না কেউ নেই। বারান্দার এক কোণে টেলিফোন।

ভদ্রলোক পা টিপে টিপে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেলেন। টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে সবেমাত্র তুলে নিয়েছেন, এমন সময়

পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল।

বেরিয়ে এলেন এক যুবতী। টেলিফোনের রিসিভার ধরা মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এদিকে ভদ্রলোকের চোখও সে দিকে। যুবতীর চোখমুখের চেহারা দেখে এক নিমেষে তিনি ছুটে গেলেন তার দিকে। তারপর যুবতীটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোহার সাঁড়াশীর মতো আঙ্গুল দিয়ে তার গলা চেপে ধরলেন।

ওই অবস্থায় প্রাণ ফাটানো চিৎকার করে যুবতীটি মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

যুবতীর প্রাণ ফাটানো চিৎকার শুনে হুড়দাড় করে সবাই ছুটে এল। ম্যানেজারও ছুটে এলেন।

চাকরটা ম্যানেজারকে কি বলল। তখন সবাই মিলে সেই ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল, মিষ্টার—মিষ্টার—দরজাটা খুলুন—

লোকটার নাম জানা হয়নি। তাই সবাই মিষ্টার মিষ্টার বলে ডাকাডাকি করতে লাগল। কিন্তু কেউ দরজা খুলল না।

তখন সবাই মিলে দরজার উপর আঘাত করতে লাগল। ধাক্কা দিতে দিতে দরজাটা এক সময় দড়াম করে খুলে গেল।

ভিতরে কেউ নেই। ঘর একেবারে ফাঁকা। ঘরের একটা জানলার গরাদ বাঁকানো।

ম্যানেজার ছুটে গেলেন জানলার দিকে। জানলার গরাদের সঙ্গে বিছানার চাদর বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই চাদর বেয়েই লোকটা নীচে গিয়েছে। নীচের দিকটা বাগান। সেখানে নেমে গাছপালার ভিতর দিয়ে রাস্তায় নেমে চলে গেছে।

ম্যানেজার আবার বারান্দায় ফিরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে টেলিফোন করে সব ঘটনা জানালেন।

কিছুক্ষণ পরই হাজির হলেন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর বার্টলে। তিনি

এসে সবার জবানবন্দী নিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

তাঁর কপালে চিন্তার কুঞ্চন রেখা। এ যুবতী মেয়েটির হত্যাকারীর মুখের চেহারা গেরিলার মতো। কিন্তু এ লোকটা বেঁটেখাটো নয়, রীতিমতো লম্বা। তাহলে এ লোকটি কে? একেই তো বেঁটে হাইডের ঠেলায় জগৎ অন্ধকার। এখন আবার লম্বা হাইড এসে জুটল।

এক রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব দোসর।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টর চিন্তিত মনে দপ্তরের দিকে ফিরে চললেন।

॥ ভাড়া বাড়ির রহস্য ভেদ ॥

পরদিন লণ্ডনের দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করে প্রকাশিত হল সেই নারীহত্যার খবর। লণ্ডনের মানুষের মধ্যে আবার গভীর

একটার পর একটা নরহত্যা ঘটে যাচ্ছে, অথচ হত্যাকারীর কোন পাত্তা নেই। সাধারণত প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পিছনেই বিশেষ একটি 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন মোটিভই তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ যেন নিছক হত্যার জন্যেই হত্যা।

লণ্ডনের পুলিশ দপ্তরও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে চাপ আসছে। তাছাড়া জনমানসেও একটা আতংক সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে মিষ্টার অ্যাটার্সনের মনেও গভীর দুশ্চিন্তা। তিনিও কিছুতেই এ রহস্যের সমাধান করতে পারছেন না। ডক্টর জেকিলের উইলের হাইড লোকটিকে তিনি খুঁজে বের করতে পারলেন না। যদিও বা এক হাইডকে খুঁজে পেলেন, সে এমন বিদঘুটে স্বভাবের যে তার কাছ থেকে কোন কথাই আদায় করা গেল না।

এখন আবার নারী হত্যাকারীর যে বিবরণ কাগজে বেরিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বেশ লম্বা ধরনের একটি লোক এই হত্যাকাণ্ডের

সঙ্গে জড়িত। হাইড খুব বেঁটে, আর এই লোকটি খুব লম্বা। সুতরাং দুজনে এক লোক হতে পারে না।

জেকিল ব্যাপারটা সব খুলে বললে রহস্যের অনেকটা সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তার কাছ থেকে কথা আদায় করা দূরে যাক, তার তো দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না।

মিষ্টার অ্যাটার্সন বেশ ধাঁধায় পড়ে মিষ্টার এনফিল্ডকে টেলিফোন করলেন। তাঁর টেলিফোন পেয়ে এনফিল্ড কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে চলে এলেন। তারপর তাঁরা দুজনে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। গন্তব্যস্থল সোহো পল্লী।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে আবার সেই ভাঙাচোরা বাড়িটার সামনে উপস্থিত হলেন।

দরজাটা সেই একই রকম তালাবন্ধ। মিষ্টার অ্যাটার্সন বাড়িটার সামনে পায়চারী করতে লাগলেন। এনফিল্ড বাড়িটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ বাঁ পাশের একটা উঁচু গম্বুজের দিকে চোখ পড়তে তাঁর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আরে। ওই গম্বুজটা তো তাঁর খুবই চেনা।

অ্যাটার্সনকে বললেন, তুমি একটু দাঁড়াও তো। আমি আসছি এক্ষুণি।

—কোথায় যাচ্ছো? অ্যাটার্সন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—ওই গম্বুজটা ছাখো।

এই বলে এনফিল্ড হনহন করে সেই ভাঙাচোরা বাড়িটার পাশ দিয়ে চলে গেলেন।

অ্যাটার্সন হাঁ করে সেই গম্বুজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরেই এনফিল্ড এসে উপস্থিত হলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার অ্যাটার্সন।

—কি অদ্ভুত ব্যাপার?

—এই ভাঙাচোরা বাড়িটা আসলে একটি বড় বাড়ির পিছনের দিক।

—তা হোক গে। তাতে কি এসে যায় ?

—সেই বড় বাড়িটা কার জানো ?

—কার ?

—ডক্টর জেকিলের। আসলে এটা জেকিলের বাড়িরই পেছন দিকের অংশ।

—বলো কি! এটা তাহলে জেকিলের বাড়ি? আর আমি এমন গাধা যে আমার মাথায় আদৌ এই কথাটা আসেনি।

—আমারও আসতো না যদি না ওই গম্বুজটা চোখে পড়ত। জেকিলের বাড়ির সামনেই ওই গম্বুজটা, ওটা আমি বহুবার দেখেছি। তাই ওটা দেখেই আমার এটা সন্দেহ হয়েছিল।

—ছ্যাখ এনফিল্ড, ব্যাপারটা ভাবতে কেমন লাগে যেন। একই বাড়ির সামনের দিক দেখতে কত সুন্দর, সেটাই সবার চেনা, আর পেছনটা কত নোংরা ভাঙাচোরা—সেটা কত অচেনা লাগে।

—মানুষও তো এমনি। এনফিল্ড হেসে বললেন, মানুষের বাইরের চেহারাটা কত সুন্দর, সেটা আমরা চিনি, আর ভেতরের চেহারাটা যত নোংরা, সেই চেহারাটাকে আমরা কেউ চিনি না।

—ঠিক বলেছো। চল আমরা একবার জেকিলের বাড়িতে যাই। যদি ওর সাথে দেখা করা যায়।

ওরা বাড়িটার পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। বাড়িটা যেখানে শেষ হল সেখানেই জেকিলের বাড়ির প্রবেশ পথ।

ওরা গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দোতলার জানলায় মুখ রেখে জেকিল দাঁড়িয়ে আছেন। উদাস নয়নে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে।

অ্যাটার্সন নীচ থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, জেকিল, একটু নীচের দিকে তাকিয়ে ছাখো তো, চিনতে পারো কিনা।

জেকিল নীচের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। দৃষ্টিতে গভীর বিষণ্ণতার ছাপ। যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর যেন চিনতে পারলেন। ম্লান হেসে বললেন, চিনতে পেরেছি। তোমরা কোথায় যাচ্ছো ?

—আমরা তোমার কাছেই এসেছি। নীচে নেমে এস তাড়াতাড়ি।

জেকিল বললেন, আমি ক্লান্ত, ভয়ানক ক্লান্ত, আমার শরীর খুব অসুস্থ অ্যাটার্সন।

—নীচে নেমে এসো। দেখা যাক কিরকম অসুস্থতা—

—না—না ভয়ের কিছু নেই। আমি শীঘ্রই সেরে উঠবো। তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না।

—তুমি নীচে নেমে এসো, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করার আছে।

—না—না—আমার একদম সময় নেই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু। এই বলে জেকিল জানলা থেকে মুখ সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

অ্যাটার্সন আর এনফিল্ড হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জেকিলের এরকম করার অর্থ কি?

॥ হাইড এখন কোথায়? ॥

ভাবনা চিন্তায় অ্যাটার্সনের প্রায় নাওয়া খাওয়া বন্ধ হবার উপক্রম। তাঁর মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, হাইড নামের ওই শয়তান লোকটা জেকিলের দারুণ ক্ষতি করবার তালে আছে। জেকিল যে কোন কারণেই হোক ওর খপ্পরে পড়ে গেছে। এমনই অবস্থা যে সে আর বেরোতে পারছে না ওর ফাঁদ থেকে।

অ্যাটার্সন এ পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি পরপর সাজিয়ে নিলেন।

এক নম্বর হল—ওই হাইড লোকটা ভয়ংকর এক শয়তান খুনী। ও কোনভাবে জেকিলকে ফাঁদে ফেলে ওর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করতে চাইছে। এই কারণে জেকিল ভয় পেয়ে তাকে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে গেছে। জেকিল স্বেচ্ছায় এটা করেনি, চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই এটা করেছে।

দু নম্বর হল : ওই হাইড লোকটাই জেকিলের বাড়ির পিছন দিকে আত্মগোপন করে আছে। জেকিল ব্যাপারটা জানে, কিন্তু জেনেও কিছু বলতে পারে না। হাইড ওর বাড়ির পিছন দিকটায় লুকিয়ে থেকে একদিকে যেমন তার সব রকম দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে জেকিলের উপর কড়া নজর রাখছে। জেকিলের সব গতিবিধি ও-ই নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ করে যার জন্য জেকিল আর এখন কোথাও বেরোতে পারে না! জেকিল বলতে গেলে ওর হাতে এক রকম বন্দী।

তিন নম্বর হল : ওই হাইড লোকটাই লণ্ডনের এই সব খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। ডক্টর ব্রাউন, স্যার কেরু, হোটেলের সেই মহিলা—এদের সকলের খুনের জন্য ওই হাইডই দায়ী।

মোটের উপর, ওই হাইড লোকটাই যত নষ্টের গোড়া। সব কিছু দুষ্কর্মের জন্য ওই দায়ী। কিন্তু ওকে ধরা যায় কিরূপে? আর ধরলেই বা ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে কি করে? ও যে এত দুষ্কর্মের জন্যে দায়ী, সে কথা প্রমাণই করা যাবে না।

জেকিল যদি মুখ খুলতেন, তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু জেকিল একেবারেই মুখ খুলছে না। তার ভাবভঙ্গী দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে খুব ভয়ের মধ্যে আছে। যে কোন মুহূর্তে ভয়ংকর একটা বিপদ হতে পারে, এটা সে জানে না। সেদিন কথা বলতে বলতে হঠাৎ মুখ সরিয়ে নিলেন। ঘরের মধ্যে যেন লুকিয়ে পড়লেন।

অ্যাটার্সন চিন্তিত মনে পকেট থেকে ডায়েরী বের করলেন কি একটা দেখবার জন্যে। আর সেই সময় ডায়েরী থেকে একটা মলিন বিবর্ণ কাগজ পড়ে গেল মাটিতে।

তুলে দেখলেন একটা ঠিকানা লেখা কাগজ। আরে, এটা তো হাইডের দেওয়া ঠিকানা লেখা কাগজ। হাইড এই ঠিকানাটা দিয়ে বলেছিল, ভবিষ্যতে এখানে দেখা হতে পারে।

এটার কথা তো তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। অ্যাটার্সন জামা

প্যান্ট পরে বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

বাইরে বেরিয়ে তিনি এবার চললেন সেই ঠিকানার উদ্দেশে।

পাড়াটা অ্যাটার্সনের চেনা। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সেই বাড়িটার সামনে এসে দেখলেন, বেশ বড় সড় একটা বাড়ি।

বাড়ির সামনে কতকগুলো ছেলেমেয়ে খেলা করছিল। অ্যাটার্সন একটি অল্পবয়সী মেয়েকে ডেকে বললেন, তুমি মিষ্টার হাইডকে একটু খবর দেবে? মেয়েটি বলল, কোন হাইড?

অ্যাটার্সন বললেন, সেই যে বেঁটে মতো একটা লোক—

—বেঁটে-লম্বা কোন হাইড এ বাড়িতে থাকে না। আগে ছিলেন হয়তো।

—তোমরা কতদিন এ বাড়িতে আছো?

—আমরা মাত্র চারদিন এ বাড়িতে এসেছি। আমার বাবা এই বাড়িটা কিনেছেন।

—কার কাছ থেকে কিনেছেন জানো?

—আমি ওসব জানিনা। আপনি আমার বাবার কাছে যান না। তিনি সব বলতে পারবেন।

—তোমার বাবা কোথায়?

—ওই যে ওই মোড়ের কাছে আমাদের দোকান আছে না, সেখানে গেলেই বাবার দেখা পাবেন।

—তোমাদের দোকানের নাম কি?

—মিষ্টার রবিনসনের দোকান বললেই লোকে দেখিয়ে দেবে।

অ্যাটার্সন এবার চললেন রবিনসনের দোকানের দিকে।

মিষ্টার রবিনসন দোকানেই ছিলেন। অ্যাটার্সন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি আপনার কাছে এসেছি বিশেষ একটি প্রয়োজনে।

রবিনসন বললেন, বলুন আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

অ্যাটার্সন বললেন, মিস্টার হাইড নামে এক ভদ্রলোক আমাকে

একটা ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন তার সাথে দেখা করতে। এই সেই ঠিকানা।

অ্যাটার্সন সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা রবিনসনকে দিলেন। রবিনসন সেটা দেখে বললেন, এটা তো আমার বাড়ির ঠিকানা।

—হাইড নামে কোন লোক এখানে থাকেন কি?

—তা তো আমি বলতে পারব না। আমি এ বাড়িতে নতুন এসেছি।

—বাড়িটা তো বেশ পুরোনো দেখছি। আপনি কি এটা ভাড়া নিয়েছেন?

—না, আমি এই পুরোনো বাড়িটাই কিনেছি।

—কার কাছ থেকে কিনেছেন বলতে আপত্তি আছে কি?

—নাঃ। আপত্তি আর কিসের। রবিনসন বললেন, আমি এটা কিনেছি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর জেকিলের কাছ থেকে।

—ডক্টর জেকিল? বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে উঠল অ্যাটার্সনের, এটা জেকিলের বাড়ি ছিল?

—হ্যাঁ, ডক্টর জেকিলেরই বাড়ি এটা। আমি অবশ্য সোজা-সুজি তার কাছে থেকে কিনিনি। ডক্টর জেকিলের এজেন্ট মেসার্স জেমস মরিসন ডক্টর জেকিলের পক্ষ থেকে এটা আমাকে বিক্রি করেছেন।

—অনেক ধন্যবাদ মিষ্টার রবিনসন। আচ্ছা চলি।

অ্যাটার্সন চিন্তিত মনে আবার পথে নামলেন।

এ তো আরো জটিলতা বেড়ে গেল। ডক্টর জেকিলের বাড়ির ঠিকানা হাইড সেদিন দিল কেন?

হাইড কি এ বাড়িটাও দখল করে ছিল? তাই তড়িঘড়ি জেকিল এটা বিক্রি করে দিলেন?

তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে—ওই শয়তান হাইড জেকিলের বাড়িগুলো দখল করতে চায়, কিংবা দখল করে বসে আছে। আসল বাড়িটার পিছনের দিকটা সে দখল

করে বসে আছে আর এটাও দখল করে ছিল। জেকিল তাই এটা বিক্রি করে দিয়েছে।

তাহলে হাইড এখন কোথায়?

॥ ভূত না দানব? ॥

পরদিন রাতের বেলায় অ্যাটার্সন নিজের বাড়িতে বসে কাজ করছেন।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল পুল। জেকিলের বাড়ির হেড বেয়ারা।

অ্যাটার্সন অবাক হয়ে বললেন, কি ব্যাপার? এত রাত্তিরে যে?

—ভূত—কর্তা ভূত। আমাদের বাড়ির ভিতর ভূত ঢুকেছে।

—ভূত? বল কি? এযুগে ভূত বলে কিছু আছে নাকি?

—আছে আছে, ভূত আছে। আমাদের বাড়ি গেলেই বুঝতে পারবেন এই খাস লণ্ডন শহরেও ভূত বহাল তবিয়তে বাস করছে।

—ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো পুল।

—খুলে বলার চেয়ে আপনি নিজে গিয়ে ব্যাপারটা দেখুন। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের কর্তা ডক্টর জেকিল আর বেঁচে নেই। ভূতের হাতে শেষ হয়ে গেছে। এই বলে পুল হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

অ্যাটার্সন ব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে। হল কি? কাঁদছো কেন?

—আমাদের কর্তাকে ভূত শেষ করে ফেলেছে।

—আচ্ছা ব্যাপারটা কি সংক্ষেপে বলো তো।

—আজ কদিন হল কর্তার ঘর থেকে অদ্ভুত একটা গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি আমরা—কখনো চিৎকার করে শয়তানকে ডাকছে, কখনও হাউ হাউ করে কাঁদছে।

—তোমাদের কর্তা ঘর থেকে বেরোন না?

—কর্তার ঘরের দরজা তো আজ মাস ছয়েক বন্ধ।

—খাবার দাবার কিভাবে দেওয়া হয়?

—আগে তো দরজার সামনে রেখে আসা হত। উনি এক ফাঁকে নিয়ে নিতেন। আজ কদিন হল খাবার দরজার সামনে পড়ে থাকছে। কেউ নেয় না।

—তার মানে খাবারের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। চল যাওয়া যাক।

অ্যাটার্সন পুলের সঙ্গে জেকিলের বাড়িতে এসে হাজির হলেন।

বাড়ির ভিতর পা দিয়েই তাঁর বুকটা যেন শিউরে উঠল। সত্যি। সারা বাড়িটায় কেমন যেন ভৌতিক পরিবেশ।

গাড়ি বারান্দার আলোটা টিম টিম করে জ্বলছে। গাছপালাগুলোর মধ্যে থেকে একটা সোঁ সোঁ শব্দ আসছে।

চাকর বাকরগুলো সব জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে। কথা বলতেও যেন ভয় পাচ্ছে ওরা।

কোথা থেকে একটা করুণ কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

পুল বলল, ওই শুনুন কান্নার শব্দ। অ্যাটার্সন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, চল দেখা যাক।

সিঁড়ি দিয়ে যত উঠতে লাগলেন, কান্নার শব্দ আরো বেড়ে যেতে লাগল।

দোতলায় উঠে ওঁরা জেকিলের ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। ভিতরে তখন কান্নার শব্দ জোরালো। কেউ মারা গেলে যেমন করুণ স্বরে কাঁদে, সেই রকম ভাবে কেউ করুণ স্বরে বিলাপ করছে।

অ্যাটার্সন বললেন, এবার তোমার কর্তার নাম ধরে ডাক তো?

পুল দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, কর্তা, কর্তা, মিষ্টার অ্যাটার্সন এসেছেন আপনার সাথে দেখা করবার জন্যে।

ঘরের ভিতর কান্নার শব্দটা থেমে গেল। ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত কণ্ঠে জবাব এল, বলে দাও দেখা হবে না।

অ্যাটার্সন চমকে উঠলেন। সত্যি। এ কার কণ্ঠস্বর। এ তো

কোন মানুষের কণ্ঠস্বর নয়। কেমন নাকী নাকী—ভাঙা ভাঙা—

পুল বলল, শুনলেন তো? একি ডক্টর জেকিলের গলা?

—না। এ জেকিলের গলা নয়! ঘাড় নাড়লেন অ্যাটার্সন। জেকিলের গলা আমি খুব ভালোমতো চিনি। এ অন্য কারো গলা। কিন্তু কার গলা?

—ভূতের। পুল বলল, ভিতরে ভূত ঢুকে বসে আছে।

—ভূতের না, ভয়ংকর একটা দানবের। অ্যাটার্সন কঠিন মুখে বললেন, হাইড নামে একটা দানব ওই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। জেকিলকে হয় শেষ করেছে, আর না হয় বন্দী করে রেখেছে। হাইড এবার ঘরটা দখল করেছে।

—হাইড কে স্যার? পুল জিজ্ঞাসা করল।

—একটা কুখ্যাত খুনী দানব। লণ্ডন শহরে কয়েকটা খুন করে আত্মগোপন করে আছে। কেন, তোমরা খবরের কাগজে তার কথা পড়োনি?

—পড়বো কেমন করে? কর্তা বহুদিন হল বাড়িতে কাগজ রাখা বন্ধ করে দিয়েছেন।

অ্যাটার্সন নীচে নেমে এসে বললেন, শোন ব্যাপার খুব সাংঘাতিক। আজই পুলিশে খবর দাও। পুলিশ এসে যা হয় করুক। তোমরা ভয় পেও না। যা জান পুলিসের কাছে বলবে।

ব্রাউন নামে একটি চাকর বলল, স্যার আমি আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি। পরশুদিন আমি বাগানে বসেছিলাম। হঠাৎ দোতলার জানলায় দেখি ভয়ংকর একটা মুখ জানলা থেকে সড়াৎ করে সরে গেল।

—তাহলে তো কোন সন্দেহই নেই—ঘরের মধ্যে খুনী লুকিয়ে আছে। তোমরা পুলিশকে ফোন কর। আমি সকালেই আবার আসবো। তোমরা সাবধানে থেকো!

অ্যাটার্সন ভারাক্রান্ত মনে বেরিয়ে গেলেন।

বাড়িতে এসে অ্যাটার্সন আর বিশ্রাম করার সময়ও পেলেন না।

তাঁর আসবার অপেক্ষায় বসেছিলেন একজন ভদ্রলোক। অ্যাটার্সনকে দেখে বললেন, আপনার বন্ধু ডাক্তার লেজিয়ন মারাত্মক অসুস্থ। আপনাকে এক্ষুণি যেতে বলেছেন। এই যে একটা চিঠি দিয়েছেন।

অ্যাটার্সন চিঠিটা খুলে ফেললেন। লেজিয়ন লিখেছেন—

প্রিয় বন্ধু,

আমি মৃত্যুশয্যায়। তুমি এই চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো। আমি তোমাকে এমন কতকগুলো গোপন কথা বলে যেতে চাই যা তোমার পক্ষে জানা খুবই জরুরী। আমি মরে গেলে এসব কথা আর জানতে পারবে না এবং এর ফলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত দেরী না করে তুমি চলে এসো।

তোমার

লেজিয়ন।

চিঠিখানা পেয়ে অ্যাটার্সন সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের সঙ্গে ছুটে গেলেন লেজিয়নের বাড়িতে।

লেজিয়নের ঘরে গিয়ে দেখলেন, তিনি বিছানার উপর শুয়ে আছেন। মলিন বিবর্ণ চেহারা। বিছানার সঙ্গে যেন মিশে আছেন।

অ্যাটার্সন দৌড়ে গিয়ে লেজিয়নের হাত ধরে বললেন, তোমার কি হয়েছে ?

—আমার কি হয়েছে ? লেজিয়নের মুখে মলিন হাসি, আমার কি হয়েছে তা আমি নিজেই জানি না।

—ডাক্তার কি বলছে ?

—কোন ডাক্তারের সাধ্য নেই আমাকে ভাল করবার। আমি নিজে ডাক্তার, আমি সব বুঝতে পারছি।

—কি বুঝতে পারছো ?

—আমার শেষ সময় একেবারে কাছে চলে এসেছে।

—কিন্তু তোমার হয়েছে কি তা তো বললে না। অসুখটা কি ?

—ইহলোকের কোন অসুখই আমার হয় নি। আমাকে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে অশরীরী এক আত্মা—যে এ জগতের কেউ নয়—

—তুমি আমাকে খুলে বলো সব।

—আমি খুলে বলতে পারবো না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি বেঁচে থাকতে আমি কাউকে কিছু বলবো না।

—কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো ?

—সে কথাও বলতে পারবো না। আমি সব কথা একটা কাগজে লিখে রেখেছি। আমার এই বালিশের নীচে খামের মধ্যে লেখাটা আছে। তুমি ওটা এখনি নিয়ে নাও।

অ্যাটার্সন লেজিয়নের বালিশের তলা থেকে খামটা বের করে নিয়ে পকেটে পুরলেন।

লেজিয়ন বললেন, আঃ। বাঁচলাম। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব।

—তুমি মরার কথা চিন্তা করছো কেন লেজিয়ন ?

—না মরে আমার উপায় নেই। ওই ভয়ংকর বীভৎস প্রেতের মুখ আমাকে সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে—ও, সে কি সাংঘাতিক দৃশ্য —ওই তো আবার সেই মুখ ধেয়ে আসছে—ওই—ওই—

লেজিয়ন ছাদের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এল। মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল।

চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ছুটে এল।

লেজিয়ন তখনও সমানে চিৎকার করছেন, ওই তো সেই প্রেত —ওই তার শুকনো স্থির দৃষ্টি—দূর হ—দূর হ—

বলতে বলতে থরথর করে কাঁপতে লাগল লেজিয়নের শরীর। তাঁর মাথাটা বালিশের উপর কাত হয়ে পড়ল। একজন ডাক্তার ডাকতে ছুটে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার চলে এলেন। এসে লেজিয়নকে

পরীক্ষা করে বললেন, সব শেষ।

—তার মানে ? অ্যাটার্সন হতভম্ব হয়ে বললেন।

—ডাক্তার লেজিয়নের হার্ট ফেল করে মৃত্যু হয়েছে।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের মুখে শোকের ছায়া নামল।

ডাক্তার চলে যাবার পর আরো কিছুক্ষণ থেকে বাড়ির লোকজনের সাথে করণীয় কর্তব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে বসবার ঘরে গিয়ে বসলেন।

পকেট থেকে খামটা বের করে চিঠিখানা পড়তে লাগলেন।—

প্রিয় অ্যাটার্সন,

আমি তোমাকে এমন কতকগুলো গোপন কথা জানাচ্ছি যার সঙ্গে ডক্টর জেকিলের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।

যেদিন লণ্ডনের হোটেলে একটি নারীহত্যা হয়, সেদিন রাতে একটা কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখি জানলার শক্ত লোহার গরাদটা দুমড়ে বেঁকে যাচ্ছে, আর তার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটা ভয়ংকর মুখ—উঃ সে যে কি ভয়ংকর মুখ, তুমি ভাবতে পারবে না—যেন প্রেতলোক থেকে এইমাত্র কোন প্রেত উঠে এল—

ভয়ে আতংকে আমার চিৎকার করবার ক্ষমতাও বোধ করি লোপ পেয়েছিল। সেই সময় সেই প্রেতটা এক লাফে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল, আমি তোমার বন্ধু ডক্টর জেকিল, আমাকে দেখে তুমি ভয় পেও না।

আমি বললাম, না তুমি জেকিল নও। জেকিল আমার দীর্ঘকালের বন্ধু।

তখন সে কাতর স্বরে বলল, বিশ্বাস কর, আমিই ডক্টর জেকিল। আমি এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছিলাম যা খেলে জীবের দেহে বিরাট পরিবর্তন আসে। প্রথমে বিড়ালের উপর পরীক্ষা করেছিলাম। পরে নিজের উপরই পরীক্ষা করলাম। দেখলাম—আমার চেহারার একেবারে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। এরপর আমি আর একটা ওষুধ আবিষ্কার করলাম যেটা খেলে আগেকার চেহারা ফিরে পাওয়া যায়। আমি ওই ওষুধটা খেয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, তখন আমার নাম হত হাইড। চেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখতাম কেউ আমাকে চিনতে পারে কিনা। কিন্তু দেখলাম, ওই চেহারায় কেউই আমাকে চিনতে

পারে না। আমি আবার বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়তাম।

লণ্ডনে যে কটি খুনের ঘটনা ঘটেছে, তার সবগুলি আমি করেছি। ডক্টর ব্রাউনকে খুন করেছিলাম এই কারণে যে তিনি বেঁচে থাকলে আমার গবেষণা সফল হত না। পরের খুনগুলো করেছি অনিচ্ছাসত্ত্বে। রাস্তার মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি আমায় দেখে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, আমি ভয় পেয়ে তার গলা টিপে তাকে চুপ করিয়ে দি। হোটেলের মেয়েটিও আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, আমি তার গলা টিপে ধরে তাকে চুপ করিয়ে দিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসছি।

আমি এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে জেকিল তথা হাইডের কথা শুনছিলাম। এবার বিললাম, আমার কাছে ছুটে আসবার কারণ কি?

হাইড বলল: তুমি আমার বন্ধু। তুমি যেভাবে হোক আমার এই চাবি নিয়ে চলে যাও আমার বাড়িতে। বাড়ির পিছনের গোপন দরজা খুলে সোজা ল্যাবরেটরীতে চলে যাও। যেখানে A মার্কা দেওয়া একটি লম্বা শিশিতে আছে প্রতিষেধক ওষুধ, সেটা এনে আমাকে দাও। সেটা খেলেই আমার চেহারার পরিবর্তন ঘটবে, আমি আবার জেকিল হয়ে যাবো।

আমি বললাম, তুমি নিজেই চলে যাও না কেন তোমার বাড়িতে। হাইড বলল, না। আমার যাবার উপায় নেই। এতক্ষণ লণ্ডনের রাস্তায় পুলিশ নেমে পড়েছে। আমাকে দেখলেই গুলি করবে।

অগত্যা কি আর করি। আমিই গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম ওর বড়িতে। পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে প্রতিষেধক ওষুধটা নিয়ে এলাম। হাইড আমার চোখের সামনেই ওষুধটা খেয়ে ফেলল, আর কি আশ্চর্য! দেখতে দেখতে সেই ভয়ংকর মুখ কুঁচকে দুমড়ে সুন্দর মুখে পরিণত হল। বেঁটে খাটো হাত পাগুলো হয়ে গেল সুন্দর সুঠাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুৎসিত ভয়ংকর হাইডের বদলে আমার সেই পুরোনো বন্ধু ডক্টর জেকিল।

আমি স্তব্ধ বিস্মিত। একই মানুষের মধ্যে দুটি রূপ! এ কি সম্ভব? সম্ভব যে হয়েছে, তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। মানুষ কি ঈশ্বরের সমান ক্ষমতা অর্জন করল?

আমার মুখে আর কথা ছিল না। জেকিল এসে আমার হাত ধরে মিনতি করে বলল, বন্ধু, তুমি কখনো একথা কাউকে বলবে না। প্রতিজ্ঞা কর।

ওর পীড়াপীড়িতে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। কিন্তু জেকিল চলে যাবার পর থেকেই আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ল। আমার ভীষণ জ্বর এসে গেল। আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল হাইডের সেই ভয়ংকর মুখ—গভীর রাতে আমার জানলার গরাদ ভেঙে উঠছে—

আমার চেতনাকে সর্বক্ষণ তাড়া করে নিয়ে বেড়াতে লাগল ওই ভয়ংকর মুখ—আমার একবার স্ট্রোকও হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, আমি আর বাঁচব না। তাই একটা কাগজে এই ঘটনা লিখে রেখে গেলাম। হাইড আর জেকিল একই ব্যক্তি। হাইড জেকিলের বিকৃত বুদ্ধির একটা রূপ। জেকিলকে বাঁচতে সাহায্য করো। ও যাতে আর হাইড না হতে পারে, সেজন্য ওর সব ওষুধ নষ্ট করে ফেলো। তুমি জেকিলের শুভানুধ্যায়ী বলেই তোমাকে সব জানিয়ে গেলাম।

ইতি
তোমার
লেজিয়ন

॥ হাইডের মৃত্যু ॥

এদিকে জেকিলের বাড়িতে পুল ততক্ষণে পুলিশ দপ্তরে টেলিফোন করে দিয়েছে। পুলিশ ইন্‌সপেক্টর একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হলেন।

পুলের মুখে সব কথা শুনে তিনি বন্ধ দরজার সামনে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন,—মিষ্টার হাইড দরজা খুলুন। না হলে দরজা ভেঙে ফেলব।

ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না।

ইন্‌সপেক্টর তখন একজন পুলিশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। পুলিশটি দরজা ভাঙার যন্ত্রপাতি নিয়ে দরজায় চাড় দিতেই দরজা খুলে গেল।

একটা চেয়ারের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে হাইড—লম্বা লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে মুখের উপর, দু চোখে পাগলের মতো দৃষ্টি—

ইন্‌সপেক্টর পিস্তল উঁচু করে বললেন, হাত তুলে দাঁড়াও, না হলে গুলি করব।



হাইড হাত তুলল না। ইন্‌সপেক্টরের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে পিছু হটতে শুরু করল।

ইন্‌সপেক্টর চেঁচিয়ে বললেন, নড়বে না খবরদার—হাইড ততক্ষণে

পাশের টেবিল থেকে একটি শিশি তুলে নিয়েছে—শিশির গায়ে 'A'।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌সপেক্টর পিস্তলের ট্রিগার টিপলেন—গুড়ুম গুড়ুম শব্দে চারদিক কেঁপে উঠল।

হাইড বুক চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাত পা ছুঁড়তে লাগল উপর নীচে। শরীরের নানা স্থানে পরিবর্তন হতে লাগল।

সেই সময় ছুটতে ছুটতে হাজির হলেন অ্যাটার্সন। তিনি ছুটে গিয়ে হাইডের পাশে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন।

হাইড ক্ষীণকণ্ঠে বলল, তুমি এসেছো অ্যাটার্সন। ভালোই হয়েছে। আমি যে উইলটা করেছি, সেটা বাতিল করে নতুন একটা উইল করেছি। সেটা ড্রয়ারে আছে। আর আমার ডায়েরীতে লিখে রেখেছি আমার হতভাগ্য জীবনের সব কথা—বিদায় বন্ধু——বিদায়—

হাইডের হাত পা ছোঁড়া বন্ধ হয়ে এল। শরীরের কাঁপুনিও থেমে গেল। এতক্ষণ সকলে অবাক হয়ে তার শরীরের পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। হাইডের ভয়ংকর মুখের বদলে এখন জেকিলের সেই সুন্দর মুখ।

হাইডের দেহটা স্থির হয়ে গেলে দেখা গেল সেখানে পড়ে আছে জেকিলের প্রাণহীন দেহ।

অ্যাটার্সনের চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল জেকিলের মুখের উপর। প্রিয় বন্ধুর এই শোচনীয় পরিণতিতে এ যেন বন্ধুর প্রতি তার অশ্রুবর্ষণ।

জেকিলের মাথাটা নীচে নামিয়ে রেখে অ্যাটার্সন ধীরে ধীরে বললেন, এক অসামান্য প্রতিভার কি শোচনীয় পরিণতি। ভাবীকালের বিজ্ঞানীরা তোমার এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে শিক্ষা নিক।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টর অবাক হয়ে বললেন, এ সব কি কাণ্ড মিষ্টার

অ্যাটার্সন। যা দেখলাম সে তো অবিশ্বাস্য।

অ্যাটার্সন বললেন, চলুন ওঘরে গিয়ে ডায়েরীখানা পড়া যাক।



তাহলেই সব জানা যাবে।

জেকিলের মৃতদেহের কাছে কয়েকজন পুলিশকে বসিয়ে রেখে ওরা ড্রয়ার থেকে ডায়েরীটা বের করে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন।

॥ ডক্টর জেকিলের ডায়েরী ॥

বসবার ঘরে বসে মিষ্টার অ্যাটার্সন ডক্টর জেকিলের ডায়েরীটা পড়তে লাগলেন :—

আমি ডক্টর জেকিল আমার গবেষণা সংক্রান্ত বিবরণগুলি আমার

এই ডায়েরীতে লিখে রাখছি।

আমি মনস্তত্ব ও রসায়ন শাস্ত্রকে এক জায়গায় ফেলবার জন্যে অনেকদিন ধরে চিন্তা করেছি। মানুষের মনের দুটি রূপ আছে—একটি চেতন ও অন্যটি অবচেতন। আমার ধারণা হয়েছে মানুষের মনের এই দ্বৈত রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার চেহারায়ও দ্বৈত রূপ আনা সম্ভব। অর্থাৎ একই মানুষ তার ভাবনা অনুযায়ী রূপ লাভ করতে পারে।

*   *   *   *   *

আমি প্রথমে গিনিপিগের উপর ওষুধের পরীক্ষা করলাম। সুন্দর একটা গিনিপিগকে ওষুধটা খাওয়াতে সেটা হয়ে উঠল একটা বাচ্চা শুয়োরের মতো। গিনিপিগকে আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনবার জন্য আবার একটা ওষুধ তৈরী করলাম। সেই প্রতিষেধক ওষুধ খাইয়ে গিনিপিগটাকে আবার আগেকার চেহারায় ফিরিয়ে আনলাম।

*   *   *   *   *

এরপর আমি একটা বেড়ালকে ওষুধটা খাওয়ালাম। ওষুধটা খাবার পর বেড়ালটা বাঘের মতো হয়ে গেল। আর খোলা জানলা দিয়ে লাফ মেরে পালিয়ে গেল। ওই বেড়ালটা নিয়ে পরে হৈ-চৈ হয়েছিল শুনেছি। ডক্টর ব্রাউন ওটাকেই ধরেছিলেন। এরপর আরো একটা বেড়ালকে ওই ওষুধ খাইয়ে আমি একই ফল পেলাম।

*   *   *   *   *

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, দৈহিক পরিবর্তনের পর কোন জীবের মৃত্যু হলে তখন আর আমার ওষুধ কাজ করে না। তখন আপনা থেকে তার আগের চেহারা ফিরে আসে।

*   *   *   *   *

একটা মানুষ পাওয়া গেলে ভাল হত। তার উপর আমার

ওষুধের গুণাগুণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু কোথায় পাব সে রকম মানুষ?

* * * * *

অবশেষে আমার নিজের উপরই এই পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। ওই ওষুধটা ইনজেকশন করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম।

* * * * *

আমার সারা শরীরে কে যেন গরম সীসা ঢেলে দিয়েছে। উঃ কি মারাত্মক কষ্ট। যন্ত্রণায় আমার শরীর নীল হয়ে যাচ্ছে।

* * * * *

আমার গায়ের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে। শরীরের নানা জায়গায় পশুর লোমের মতো বড় বড় লোম গজিয়ে যাচ্ছে। চামড়া খসখসে। আমার নাকটা বিশাল হয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখখানা গেরিলার মতো হয়ে যাচ্ছে। আমার নিজের এই পরিবর্তিত রূপ দেখে আমি নিজেই ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠছি। উঃ। কি বীভৎস। এ কি আমার অবচেতন মনের শারীরিক রূপ? এই পরিবর্তনে সময় লাগল তিন মিনিট।

এখন আমি এই পরিবর্তিত চেহারায় আছি। এখন আমি মিষ্টার হাইড। আমার মনের মধ্যে শুধু খুনের কিংবা জঘন্য কাজ করার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। হয়তো ডক্টর জেকিল মিষ্টার হাইডকে খারাপ কাজ করতে দিচ্ছে না।

* * *

আমি এবার প্রতিষেধক ওষুধটা খেয়ে নিলাম। আবার সেই অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা। শরীরের কোষে কোষে যেন তপ্ত লোহা। তিন মিনিটের মধ্যে আমি আবার আগেকার চেহারা ফিরে পেলাম।

বাঃ। তাহলে আমি তো ঈশ্বরের মতো স্রষ্টা হয়ে গেলাম। আমি যখন এক মানুষের মধ্যে থেকে দুটো চেহারা বের করতে পারলাম, তখন হয়তো অদূর ভবিষ্যতে পুরো মানুষও তৈরী করতে পারব।

* * *

একটা ভারী মুস্কিলে পড়ে গেছি। রাত এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে এখন আপনা থেকেই পরিবর্তন আসছে। একটা ব্যাপার দেখছি—কোন কুৎসিত কিছু দেখলে কিংবা বিকৃত কোন চিন্তা মনে এলেও আমার মধ্যে সেই পরিবর্তন চলে আসে। আমি ডক্টর জেকিল থেকে আপনা হতেই হাইড হয়ে যাই। এসব আমার পক্ষে খুব চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন আমি কি করব ?

* * *

আমার ভয় হচ্ছে, আমি হয়তো একদিন আগেকার চেহারায় ফিরে আসতে পারব না। আমি প্রচুর পরিমাণে প্রতিষেধক ওষুধ তৈরী করে রেখেছি। আর আমার বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি উইল করে হাইডকে দানপত্র করে দিলাম। যাতে জেকিল হয়ে না উঠলেও হাইড হয়ে অন্তত সেসব ভোগ করতে পারি।

* * *

আমি সোহো পল্লীতে একটা বাড়ি কিনে ফেললাম। যদি নিজের বাড়িতে যাবার অসুবিধা হয়, তবে ওই বাড়িতেই না হয় 'হাইড' হয়েই বাস করব।

* * *

উঃ। এখন আমার কি ভয়ংকর অবস্থা। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়লাম জঘন্য খুনী। আমি একটার পর একটা খুন করে চলেছি। আমার মধ্যে যে শয়তান আছে, তাকে ভীষণ ভাবে জাগিয়ে

তুলেছি। এখন খুন করা আমার কাছে জলভাত। কথা বলতে বলতে আমি গলা টিপে ধরতে পারি। মানুষ খুন করা আর মশা মারা আমার কাছে একই ব্যাপার।

*   *   *

সর্বনাশ হতে চলেছে। আমার প্রতিষেধক ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। এদিকে আমি কদিন হল 'হাইড' হয়ে রয়েছি। ওষুধের অভাবে আমি আর কিছুতেই 'জেকিল' হতে পারছি না। হে ঈশ্বর একি করলে। আমি তোমার উপর বড় হতে চেয়েছিলাম। এ কি শাস্তি দিলে আমাকে।

*   *   *

পুলিশ হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার নামে অনেকগুলো নরহত্যার চার্জ। আমার আর বেঁচে থাকবার কোন উপায় নেই। এই বিকৃত কদাকার 'হাইড' হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। আমি আত্মহত্যাই করব।

*   *   *

আমার বাড়ির লোকজন চাকরবাকর আমার সম্বন্ধে নানা কথা ভাবছে—আমাকে প্রেত ভাবছে। ওরা ভয় পেয়ে অ্যাটার্নকে ডেকে এনেছে। মনে হচ্ছে এবার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢুকবে। যাক আমি আমার আগের উইলটা পালটে ফেলেছি। এখন আমার মরতে ভয় নেই। আমার মৃত্যুর পর যেন উইল অনুযায়ী কাজ করা হয়।

এর পর আর কিছু লেখা নেই ডায়েরীতে।

অ্যাটার্ন বললেন, এবার উইলটা দেখতে হবে ইনসপেক্টর। ড্রয়ার খুলে উইলটা বের করা হল। উইলে লেখা আছে আমি ডক্টর জেকিল, আমার পূর্বের সব উইল বাতিল করে, এই নতুন উইল

করছি। আমি এই উইল কুমারী ফ্লোরিনাকে দান করে যাচ্ছি। সে যেন মনোমতো কোন যোগ্য পাত্রকে বিবাহ করে সুখী হয়।

পুলিশ ইনসপেক্টর বললেন, এত বড় একজন বিজ্ঞানীর এমন শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনায় আমি সত্যিই দুঃখিত। অ্যাটার্ন ধীরে ধীরে বললেন, আপনার কোন দোষ নেই ইনসপেক্টর। আপনি গুলি না ছুঁড়লেও মরতে ওকে হতোই। হয়তো মরেই ও বেঁচে গেল।

॥ সব শেষে শুধু কান্না ॥

পরদিন লণ্ডনের সমস্ত সংবাদপত্রে ডক্টর জেকিল আর হাইডের সচিত্র বিবরণ। প্রথম পৃষ্ঠায় পাশাপাশি দুটি বড় ছবি। প্রথম ছবিতে সুন্দর সুবেশ হাসিমাখা একটি তরুণ মুখ। নীচে লেখা ডক্টর জেকিল। অন্য ছবিতে বীভৎস কুৎসিত ভয়ংকর দর্শন একটা গেরিলা মানুষের মুখ। নীচে লেখা মিষ্টার হাইড। এক একটা কাগজে চাঞ্চল্যকর ক্যাপশন: এই শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার একই মানুষের দ্বৈতরূপ, 'মানব ও দানব'।

এর পর ডক্টর জেকিলের চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার; কিভাবে সেই আবিষ্কার নিজের উপর প্রয়োগ করেছেন তারপর তার শরীরের রূপান্তর ঘটেছে—হাইডরূপে কিরূপে একের পর এক নক্সা করেছেন—বিভিন্ন ঘটনা পর পর সাজিয়ে বড় বড় কাহিনী তৈরী করা হয়েছে।

শধু লণ্ডন শহরের মানুষ না, সারা বিশ্বের মানুষ ডক্টর জেকিল আর মিষ্টার হাইডের বিবরণ পড়ে বিস্মিত স্তব্ধ বেদনার্ত।

অন্য সবার মতো ফ্লোরিনাও সকালের খবরের কাগজটা খুলে জেকিলের ছবি দেখে প্রথমে উল্লসিত হয়ে উঠল। নিশ্চয় বিরাট কোন আবিষ্কার করেছে। তাই কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এত বড় করে তার ছবি।

আগ্রহভরে সবটা পড়তে পড়তে তার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে উঠল। হায় ঈশ্বর! তার স্বপ্ন, সব সাধ এইভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। এতদিন

ধরে যে আশায় আশায় রয়েছে, জেকিলের গবেষণার শেষ হবে—তারা দুজনে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করবে।

এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল। এখন সে কি নিয়ে বাঁচবে? সে যদি আগে জেকিলের এই ভয়ংকর গবেষণার একটুও আভাস পেত, তাহলে কিছুতেই সে ওই মৃত্যু-খেলায় তাকে মেতে উঠতে দিত না। যেভাবে হোক, তাকে এই গবেষণা থেকে নিবৃত্ত করতই।

ফ্লোরিনা খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

অ্যাটার্সন এসে ঢুকলেন। ফ্লোরিনাকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে বললেন, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত ম্যাডাম। ডক্টর জেকিলের শেষ ইচ্ছানুযায়ী একটা উইল আপনাকে দিতে এলাম।

—কিসের উইল? ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ফ্লোরিনা।

—ডক্টর জেকিল তাঁর স্থাবর অস্থাবর বিষয়সম্পত্তি সব কিছু আপনার নামে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। আর আপনার কাছে তিনি ক্ষমাও ভিক্ষা করে গিয়েছেন। এই নিন সেই উইল।

—ওই উইল নিয়ে আমি কি করব? দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল ফ্লোরিনা, জেকিলের সাথে সাথে আমারও সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আমার কিছু নেই, কেউ নেই।

কাঁদতে কাঁদতে ফ্লোরিনা নীচে লুটিয়ে পড়ল।

॥ শেষ ॥